সেচপত্র

জানুয়ারি, ২০১৪

মহানন্দা মুখ্য খালের সংস্কারের কাজ

সেচপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

ঊনবিংশ বর্ষ □ জানুয়ারি ২০১৪

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি

রাজীব ব্যানার্জী

মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

মুখ্য বাস্তুকার, সাউথ অ্যান্ড বাজেট

সংযুক্ত সম্পাদক

রাজকাপুর শর্মা

নির্বাহী বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার

সহ-বাস্তুকার

স্বাতী দাস

অবর সহ-বাস্তুকার

জলসম্পদ ভবন □ বিধাননগর, সল্টলেক

দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮ □ ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৩৪-৬২৪৫/২৩২১-৪৯২৮/২৩৩৪-৬০৯৮

ই-মেল : dvcsc6816@gmail.com

ওয়েব সাইট : www.wbiwd.gov.in এবং

e-procurement.www.wbiwd.gov.in→homepage→e.procurement→wbtender.gov.in

হেল্প লাইন : জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর—১৮০০৩৪৫০১১৭

জলপাইগুড়ি, ক্লাব রোড—১৮০০৩৪৫৩২৩১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষে **স্বপন কুমার রায়**, অধীক্ষক-বাস্তুকার, কর্তৃক জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত / ২০১৪

সেচপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

শুভেচ্ছা ❖ শ্রী রাজীব ব্যানার্জী, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪

শুভেচ্ছা ❖ শ্রী মন্টুরাম পাখিরা, রাষ্ট্রমন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫

শুভেচ্ছা ❖ শ্রী গোপালকৃষ্ণ, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬

শুভেচ্ছা ❖ শ্রী ধীমান মুখার্জী, সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭

আবেদন ❖ শ্রী কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, মুখ্য বাস্তুকার, সাউথ অ্যান্ড বাজেট ৮
প্রধান সম্পাদক 'সেচপত্র', সেচ ও জলপথ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম ৯

সাফল্যের আড়াই বছর ❖ রাজীব ব্যানার্জী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ ১০

ই-টেন্ডারিং ❖ রাজকাপুর শর্মা, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর
দিলীপ কর্মকার, সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১২

নদী ভাঙন থেকে প্রাচীন মায়াপুরকে রক্ষার জন্য কর্মকাণ্ড ❖ সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়,
নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১৫

সুন্দরবন নদীবাঁধ এবং আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ ❖ অমিত কুমার কুণ্ডু,
ভূতপূর্ব অধীক্ষক বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ১৯

সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার নিরিখে কিছু ভাবনা ❖ দিলীপ কর্মকার,
সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২৬

সংক্ষিপ্ত সংবাদ : ৩০

সম্পাদকীয়

'সেচপত্র' পত্রিকা ঊনবিংশ বর্ষে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র এই পত্রিকা। নতুন কলেবরে এই সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় আমরা সেচ ও জলপথ বিভাগের সদ্য আরোপিত ই-টেন্ডারিং-এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছি। আছে প্রাচীন মায়াপুরকে রক্ষার কর্মকাণ্ডের একটি আলোচনা। সুদীর্ঘ লেখাতে আলোচিত হয়েছে নদীবাঁধ এবং আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ। আর আছে একটি আলোচনা 'সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা নিরিখে কিছু ভাবনা'। এছাড়া পত্রিকাতে যেমন নিয়মিত বিভাগ ছিল, তেমনি আরও অন্যান্য নানান তথ্য যেগুলি পাঠকদের আকৃষ্ট করবে।

বিগত সংখ্যাগুলিতে যেভাবে পাঠকদের আকৃষ্ট করত তেমনিভাবে এই সংখ্যাটিও সকলের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

শুভেচ্ছাপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' পত্রিকাটি নতুন কলেবরে প্রকাশিত হবার জন্য আমি শুভেচ্ছা জানাই। সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে, উদ্যোগে ও সুপরামর্শে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সেচ ও জলপথ বিভাগও এই কর্মযজ্ঞের শরিক। এই সকল কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সেচপত্রে প্রকাশিত হওয়ার ফলে রাজনীতিবিদ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী সহ পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেই অবগত হবেন। ফলে বিভাগের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ দৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেচপত্রে প্রকাশিত দপ্তরের বাস্তুকারদের মতামত ও অনেক বিদগ্ধজনের অভিমত, বহু সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ সুগম করবে।

আগামী দিনে দপ্তরের বিশাল কর্মকাণ্ডে সেচসুবিধা বৃদ্ধি ও বন্যা মোকাবিলা এবং আনুষঙ্গিক নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত সেচপত্রে প্রকাশিত হবে এই আশা রাখি।

পত্রিকার সাফল্য কামনা করি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

শ্রী রাজীব ব্যানার্জী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র **'সেচপত্র'** প্রায় আঠারো বছর অতিক্রান্ত। সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তৎপরতায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সেচ ও জলপথ বিভাগেও এই কর্মযজ্ঞ অব্যাহত। এই সকল কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সেচপত্রে প্রকাশিত হলে রাজনীতিবিদ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী সহ জনপ্রতিনিধি সকলের গোচরে আসবে। এর ফলে বিভাগের সঙ্গে জনসাধারণের মতামতের আদানপ্রদান ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। দপ্তরের বাস্তুকারদের মতামত সহ বিদগ্ধজনের অভিমত সেচপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে অনেক সমস্যা ও তার প্রতিকারের পথ সুগম হবে।

পত্রিকা প্রকাশে সাফল্য কামনা করি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রী মন্টুরাম পাখিরা
রাষ্ট্রমন্ত্রী
সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র **'সেচপত্র'** পত্রিকাটি নতুন কলেবরে প্রকাশিত হবার জন্য আমি আনন্দিত। এই পত্রিকাতে সেচব্যবস্থা ও বন্যা মোকাবিলার বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে থাকে। পত্রিকার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, ছাত্রছাত্রী সহ মননশীল সাধারণ পাঠকরা, বিভাগের বিভিন্ন বিষয় জানতে সমর্থ হবেন। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রকাশও করতে পারবেন। বিগত সংখ্যাগুলির মত এই সংখ্যাটি সকল পাঠকের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হবে বলে আমি আশা রাখছি।

'সেচপত্র' পত্রিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শ্রী গোপালকৃষ্ণ
অতিরিক্ত মুখ্যসচিব
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র **'সেচপত্র'** পত্রিকাটি নূতন কলেবরে প্রকাশিত হবার জন্য আমি আনন্দিত। রাজ্যের সেচব্যবস্থা ও বন্যা মোকাবিলায়, সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের আলোচনা, এই পত্রিকার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী সহ মননশীল সাধারণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপনা করাই বিভাগের উদ্দেশ্য। আগামী সংখ্যাগুলিতে সমানভাবে দপ্তরের কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রযুক্তিবিদদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশিত হবে এবং পাঠকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে এই আশা রাখি।

'সেচপত্র' পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

শ্রী ধীমান মুখার্জী
সচিব
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র **'সেচপত্র'** প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার যেসব লেখা এই পত্রিকাতে স্থান পায় তা জনপ্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছায়।

পত্রিকা প্রকাশে ধারাবাহিকতা রাখার লক্ষ্যে পত্রিকার পাঠকদের কাছে তাদের মতামত পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি। আবেদন করছি সেচ ও জলপথ বিভাগের এবং দপ্তরের সকলের কাছে উপযুক্ত ছবিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সুচিন্তিত মতামতের লেখা পাঠাবার জন্য। সংক্ষিপ্ত সংবাদের স্বার্থে ক্যাপশন-সহ ছবি পাঠিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করার আবেদন করছি।

'সেচপত্র' পত্রিকা প্রকাশে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

শ্রী কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
মুখ্য বাস্তুকার সাউথ অ্যান্ড বাজেট
ও
প্রধান সম্পাদক, 'সেচপত্র'
সেচ ও জলপথ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম

মাননীয় সম্পাদক

মহাশয়,

আমি আমাদের এখানকার একটি মেলাতে আপনাদের স্টল থেকে কয়েকটি সেচপত্রের কপি সংগ্রহ করেছি। এই পত্রিকাগুলি পড়ে আমি বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। আপনাদের লেখাগুলিতে তথ্যসমৃদ্ধ ছবি থাকার ফলে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তা জানালে ভালো হয়। সেচপত্রের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ও আগামী দিনে আরো তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সেচপত্রে পাব বলে আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে—

অশোক সরকার

বারাসাত, কাজিপাড়া উত্তর ২৪-পরগনা

মাননীয় সম্পাদক

মহাশয়,

অনেকদিন আপনাদের সেচপত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। আপনাদের তথ্যভিত্তিক পত্রিকাটি আমার খুব প্রয়োজনে লাগে। অনুগ্রহ করে প্রতিটি সংখ্যা সংগ্রহ করার স্থান জানালে ভালো হয়।

নমস্কারান্তে—

ধীরেন দাস

বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪-পরগনা

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

(ক)	পত্রিকার নাম	: সেচপত্র
(খ)	পত্রিকার ভাষা	: বাংলা
(গ)	প্রকাশের স্থান	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ঘ)	প্রকাশ কাল	: ত্রৈমাসিক
(ঙ)	মুদ্রাকরের নাম	: স্বপন কুমার রায়
(চ)	মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা	: ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ছ)	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	: স্বপন কুমার রায়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(জ)	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	: কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ঝ)	স্বত্বাধিকারী	: সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(ঞ)	স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

আমি, স্বপন কুমার রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : স্বপন কুমার রায়

সাফল্যের আড়াই বছর

রাজীব ব্যানার্জী

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ বিগত আড়াই বছর সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বহু কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে ও করে চলেছে। রাজ্যের সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে সেচ ও জলপথ বিভাগ একদিকে যেমন জনসাধারণের বহু বছরের কাঙ্ক্ষিত আশা বেশ কিছুটা পূরণ করেছে, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে ক্যানেল ও নিকাশি খালের ওপর বহু সেতু তৈরির বিশাল কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। এছাড়াও জনসাধারণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা পূরণের লক্ষ্যে আরো নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

- কয়েক দশক ধরে অবহেলার শিকার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে সেচখাল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ১,৩৪,০০০ একর জমিতে বহু বছর বাদে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সেচের জল।
- এছাড়াও চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ৫৮,০০০ একর ও আগামী আর্থিক বছরে আরো ১,২৪,০০০ একর জমি সেচসেবিত করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- চলতি রবি / বোরো মরশুমে বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে ৮,৯৫,০০০ একর জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে, যা বিগত ৭ বছরে সর্বোচ্চ।
- উত্তরবঙ্গে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় রবি / বোরো মরশুমে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে প্রায় ১,১০,০০০ একর জমিতে যা অতীতে কখনও হয়নি।
- খরাপ্রবণ পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হচ্ছে ১৪-টি চেক ড্যাম। আগামী আর্থিক বছরে প্রস্তাব রয়েছে আরো ২৩-টি চেক ড্যামের প্রকল্প রূপায়ণের।
- ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে মূলত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় ৩৩০ কিমি নদী, নালা ও খাল সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরে কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, চণ্ডিয়া, হিজলী টাইডাল ক্যানেল ইত্যাদি, হাওড়ায় দামোদর শর্টকাট চ্যানেল, নয়াবাজ ও বাইগাছি খাল, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং কলকাতায় আপার ও লোয়ার বাগজোলা খাল, টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম খালব্যবস্থা, ইছামতী নদী, বেলেঘাটা খাল ইত্যাদি।
- এছাড়াও দেনান-দেহাটি, শঙ্করআড়া, মজা দামোদর, কেষ্টপুর-ভাঙ্গরকাটা, নোয়াই, মণিখালি সহ আরো অজস্র খালের সংস্কারের জন্য সাম্প্রতিককালে অনুমোদিত হয়েছে একগুচ্ছ প্রকল্প।
- বহু প্রতীক্ষিত 'ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান' এখনও কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।
- সমাপ্ত ও এমনকি আংশিক সমাপ্ত কাজগুলির সুফল মিলেছে হাতে নাতে। গত মরশুমে অতি ভারী বর্ষণ সত্ত্বেও ঐতিহাসিকভাবে বন্যাপ্রবণ কেলেঘাই-কপালেশ্বরীর নিম্ন অববাহিকায় ও অন্যান্য অঞ্চলে জল নেমেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, মিলেছে স্থানীয় মানুষের বুকভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।

* গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে নদী ও সমুদ্র ভাঙ্গন রোধ ও বাঁধ সংরক্ষণের বিশাল কর্মযজ্ঞ।
* গত আড়াই বছরে সুন্দরবনে 'আয়লা'-য় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসহ বিভিন্ন জেলার ৫১৮ কিমি দৈর্ঘ্যে ভাঙ্গনরোধী ও বাঁধ মজবুতিকরণ তথা পুনর্নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো ১০০ কিমি দৈর্ঘ্যে কাজ চলছে।
* শেষ হওয়া এবং সমাপ্তপ্রায় প্রকল্পগুলির উল্লেখযোগ্য হল রূপনারায়ণের ভাঙ্গন থেকে ঐতিহাসিক তমলুক শহর রক্ষা ও দীঘা-শঙ্করপুরের সমুদ্রভাঙ্গন তথা সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প।
* ভাঙ্গনরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নততর প্রযুক্তি যেমন জিও-সিন্থেটিক-ফিল্টার ও ব্যাগ এবং কনক্রিট ব্লক।
* মুর্শিদাবাদে 'কান্দি মাষ্টার প্ল্যান'-এর পর্যায়ক্রমে রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
* গত আড়াই বছরে গোটা রাজ্যে ৩০-টি পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করে যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।
* ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূলত প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ছোট বড় নদী ও খালের উপরে সর্বমোট ৯৫-টি নতুন সেতু নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার নজির সেচ ও জলপথ বিভাগের ইতিহাসে নেই।
* এর মধ্যে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জোরকদমে কাজ চলছে ৪৩-টি সেতুর, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কংসাবতীর উপরে লালগড় সেতু।
* সদ্য অনুমোদিত হয়েছে আরো ৫২-টি সেতুর, সেগুলির কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।
* এছাড়াও আগামী আর্থিক বছরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় জীর্ণ কাঠের সেতুগুলির পরিবর্তে পাকা সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।
* মালদা জেলায় মহানন্দা ও ফুলাহার নদীর পাড়ে মাত্র সাড়ে তিন মাসে তৈরি হয়েছে ৭৩ কিমি পীচ রাস্তা।
* ইতিমধ্যেই চালু হওয়া বড় কাজের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে ৫ লাখ টাকার বেশি মূল্যের যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে।
* ধাপে ধাপে জেলার অফিসগুলিতে ই-গর্ভন্যান্স চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
* বর্ষার মরশুমে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দক্ষিণবঙ্গের জন্য বিভাগীয় সদর দপ্তর বিধাননগরে ও উত্তরবঙ্গের জন্য জলপাইগুড়ি জেলায় কন্ট্রোলরুমে চালু হয়েছে ২৪ × ৭ টোল ফ্রি হেল্পলাইন।

যে-সকল কাজ এই আড়াই বছরে সেচ ও জলপথ বিভাগ সম্পন্ন করেছে তার সুফল সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ ইতিমধ্যে পাচ্ছেন ও তাঁদের বহুদিনের চাহিদা ইতিমধ্যে পূরণ হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় ও ঐকান্তিক প্রয়াসে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, এই আস্থা এবং বিশ্বাস আমাদের আছে।

লেখক : ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সেচ ও জলপথ বিভাগ

e-Tendering
ই-টেন্ডারিং

রাজকাপুর শর্মা ও দিলীপ কর্মকার

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা অবস্থান করছি। তথ্য ভাণ্ডারের আদান-প্রদান চলছে সমগ্র বিশ্বে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নতুন নতুন ভাবনার উদয় হচ্ছে। সেচ ও জলপথ বিভাগ বিজ্ঞানের সৃষ্ট তথ্য প্রযুক্তির সুফল ব্যবহার করে দপ্তরের কাজকর্ম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও সকলের কাছে সহজে পৌঁছানোর বিষয়ে ই-টেন্ডারিং (e-Tendering)-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। National Informatics Centre, Govt. of India-র সহযোগিতায় ও দপ্তরের আধিকারিকদের দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রমের পর ১০ অক্টোবর, ২০১১-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরর সেচ ও জলপথ বিভাগের ই-টেন্ডারিং-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে দপ্তরের বিভিন্ন কাজের দরপত্র আহ্বানে যেমন স্বচ্ছতা এসেছে তেমনি সকল কাজের বিষয়ে জনগণ অবগত থাকছে। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে দপ্তরের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ই-টেন্ডারিং-এর বিষয় বলতে গেলে, পূর্বে যে ভাবে দরপত্র (Tender) আহ্বান করা হত, সেই বিষয়ে প্রথমে বলা প্রয়োজন। কোনো কাজ ঠিকাদার মারফৎ করাবার জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তরের কোনো ভুক্তির (Division Office) আধিকারিক বা কোনো মণ্ডলের (Circle Office) আধিকারিক দরপত্র আহ্বান করেন। এই দরপত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন নিজেদের নোটিশ বোর্ডে ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হয়ে থাকে। কাজের মূল্য বেশি হলে এই সকল ঠিকাদারের গোচরে আনার জন্য অর্থাৎ বহুল প্রচারের জন্য দৈনিক সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিজ্ঞাপন দেখে ঠিকাদাররা নিজেদের

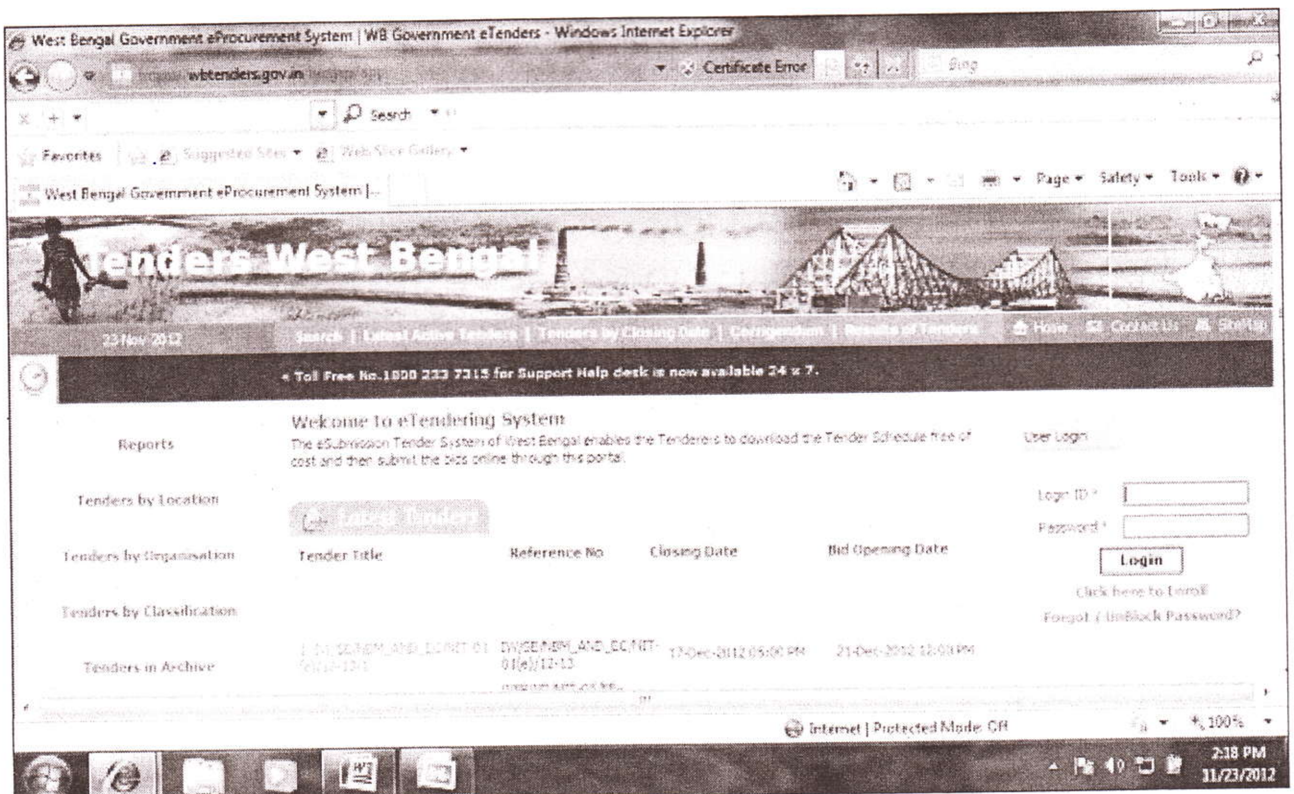

পূর্ব কাজের যোগ্যতানুসারে যে কাজটি পছন্দ করে তার দর তিনি প্রদান করেন। বিভিন্ন ঠিকাদারদের দরের মধ্যে যে ঠিকাদারের দর সর্বনিম্ন হয় সেই ঠিকাদার ওই কাজ করার অনুমতি পান। অবশ্য নিয়মানুসারে দরপত্র ক্রয়ের মূল্য ও তার নির্ধারিত দর প্রদান করে (Earnent money) বায়না বাবদ কাজ অনুসারে মূল্য প্রদান করতে হয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং (e-Tendering)-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটামুটি একই পদ্ধতিতে শুধু ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে কাজের বিজ্ঞাপন (Notice), দরপত্রের ছক (Tender Paper), ঠিকাদারের ওই কাজের যোগ্যতা (credentials), বিভিন্ন শর্ত ও নিয়মাবলী (Terms & Conditions)– এই সকল বিষয় Website-এ দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে Websiteটি শুধু রাজ্যে নয়, দেশের এমনকি বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে দেখা যাবে। ফলে ঠিকাদার / নিলামদাররা (Bidder) রাজ্যের বা দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে তাঁদের নির্ধারিত দর প্রদান করতে পারবেন। এই e-Tendering-এর মাধ্যমে যে সব কাজে বিশেষ প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেই সকল কাজের জন্য সমস্ত বিশ্বের ইচ্ছাকৃত নিলামদারদের দর থেকে সর্বনিম্ন দর বাছাই করতে অনেক সুবিধা হবে। এ ক্ষেত্রে কাজের বিজ্ঞাপনের বহুল প্রচার অব্যাহত থাকবে।

ই-টেন্ডারিং করার ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের নোটিশ বা কাজের বিস্তারিত বিবরণ-সহ অন্যান্য কী ভাবে Web-site-এ দিতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে দপ্তরের যে সকল আধিকারিকরা দরপত্র আহ্বান করবেন তাদের প্রত্যেককে ডিজিট্যাল স্বাক্ষরের সার্টিফিকেট (Digital Signature Certificate) নিতে হবে। এই কার্ডটি NIC (National Informatics Centre) Govt. of India থেকে নিতে হবে। সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আধিকারিকদের NIC-এর নির্ধারিত ফর্ম পূর্ণ করে সঙ্গে নিজেদের PAN কার্ডের অথবা ভোটার আই.ডি. কার্ডের ইত্যাদির ফটোকপি যুক্ত করে দিতে হবে। ফর্মে অবশ্যই আধিকারিকদের নাম-ঠিকানা, অফিসের নাম-ঠিকানা, তাঁর পদ-সহ নিজের ফোন নং ও e-mail ID দিতে হবে। পূর্ণ করা ফর্মটি দপ্তরের কোনো মুখ্য বাস্তুকার সুপারিশ করবেন। ঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম নির্দিষ্ট মূল্য (Fee) সহ NIC দপ্তরে পাঠালে সময়ে এই ডিজিট্যাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এই সার্টিফিকেটের একটি নির্দিষ্ট নম্বর আছে, যা ওই আধিকারিকের জন্য নির্দিষ্ট। Website-এ টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাঠানোর জন্য ও সময়শেষে পুনরায় খুলে সমস্ত নথিপত্র Down Load করার জন্য ওই সার্টিফিকেটের নম্বর প্রয়োজন। ই-টেন্ডারিং-এর দুটি অংশ আছে। একটি টেকনিক্যাল (Technical) অংশ, অপরটি ফিনানসিয়াল (Financial) অংশ। ফিনানসিয়াল অংশে থাকবে শুধু BOQ (Bill of Quantities) অর্থাৎ (Tender Schedule) দরপত্রটি। আর টেকনিক্যাল অংশে থাকবে কাজের শর্ত ও নিয়মাবলী, নিলামদারদের কাজের যোগ্যতা, কাজের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। বায়নার মূল্য, টেন্ডারটি সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার দিন ও সময়, টেন্ডারটি কবে ও কোন সময়ের পর বন্ধ হবে, কোন দিন কোন সময়ে টেন্ডারগুলি খোলা হবে ও বাছাই হবে ইত্যাদি দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ফিন্যানসিয়াল অংশে দিতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের পর নিলামদাররা (Bidder) টেন্ডার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিজেদের কমপিউটারে ওয়েবসাইট খুলে দেখতে পারেন। তাঁদের পছন্দমতো, যোগ্যতানুসারে যে কাজটির জন্য দর প্রদান করবেন তা ওই on line-এ দিতে পারবেন। দরপত্র আহ্বানকারীর চাহিদানুসারে ও তার দেওয়া ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট গঠনে দিতে হবে। দেশের এমনকি বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে নিলামদাররা তাদের যে কোনো কাজের দর on line-এ দিতে পারবেন অর্থাৎ ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

নিলামদারদের দর প্রদান করার দিন ও সময় অতিবাহিত হবার পর পূর্ব নির্ধারিত দরপত্রগুলি খোলার দিন ও সময়, Server-এর সময়ের সঙ্গে এক হলেই ওই দরপত্রগুলি খুলে দেখা যাবে। পূর্বে এই নিলামদারদের পূরণ করা দরপত্রগুলি খোলার জন্য নূন্যতম দুই বা যে কয়জনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক আধিকারিকের উপস্থিতিতে এবং তাদের ডিজিট্যাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের নম্বর ব্যবহার করে খোলা যাবে। দুই বা অধিক আধিকারিক এই দরপত্র খুলতে পারবেন। তারপর যোগ্যতা মান পেরোলে তাদেরকে টেকনিক্যাল যোগ্য হিসেবে নির্বাচন করবেন ও রিপোর্ট ওয়েবসাইটে তুলে দেবেন। এরপর যিনি দরপত্র আহ্বান করেছেন তার ধার্য্য করা নির্দিষ্ট দিনে ফিনানসিয়াল দরপত্র খোলা হবে শুধুমাত্র সেই সব নিলামদারদের যারা ই.এম.ডি. প্রদান করেছেন। যে সকল নিলামদাররা দরপত্রে দর প্রদান করেছেন তাদের বায়নার মূল্যের ব্যাঙ্কের ডিমান্ড ড্রাফ্টের মূল কপিটি (original) আহ্বানকারী আধিকারিকের কাছে পূর্বেই জমা করতে হবে। । এর পর সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী নিলামদার অন্যান্য নিয়ম পালন করবেন কাজ করার অনুমতি পাওয়ার জন্য।

এবার আলোচনা করা যাক, নিলামদাররা (Bidder) কীভাবে এই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করবেন। আধিকারিকদের মতো নিলামদারদেরও ডিজিট্যাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট নিতে হবে। NICCA-র তরফ থেকে নিয়োগ করা প্রতিনিধির মাধ্যমে এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যেতে পারে। একটি Help Deskও খোলা হয়েছে যার

ফোন নং : 2334-6098। এই ফোনে যোগাযোগ করে প্রাথমিকভাবে নিলামদারদের ডিজিট্যাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট করার নিয়মাবলিও কীভাবে করতে হবে তা জানা যেতে পারে। দপ্তরের আধিকারিকরাও এই ডেস্ক থেকে তাদের চাহিদানুসারে তথ্য জানতে পারেন। নিলামদারদের ফটো, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন-এর ফটোকপি, PAN Card-এর ফটোকপি, ট্রেড লাইসেন্স (Trade Licence), যৌথ কারবারের (Partnership Form) ক্ষেত্রে দলিলের ফটোকপি, কারবারের লেটার প্যাড (Letter Pad) ইত্যাদি-সহ নির্দিষ্ট ফ্রি প্রদান করে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। মোটামুটি তিন-চারদিনের মধ্যে নিলামদাররা তাঁদের সার্টিফিকেট ও ID নম্বর পাবেন। ডিজিট্যাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট নিলামদাররা সংগ্রহ করার পর NIC Portal-এর NIC Site-এ অথবা সেচ ও জলপথ বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট www. wbiwd.gov.in-এর E-Procurement-এ click করলে দপ্তরের বিভিন্ন কাজের যে দরপত্রগুলি আহ্বান করা হয়েছে তা দেখা যাবে। Log on করে Work site-এ থেকে download করে দরপত্র দেখতে পাবেন। নিয়মানুসারে বায়নার জন্য ব্যাঙ্কের ডিমান্ড ড্রাফ্টের ও অন্যান্য সমস্ত প্রমাণপত্রের Scan করে PDF format-এ My document folder-এর মধ্যে দিয়ে upload করতে হবে। দরপত্রে নিলামদারের দর প্রয়োগ করে Drop করতে হবে। দরপত্রে দর প্রদানের শেষ দিন পর্যন্ত কোনো নিলামদার তাঁর দর দেওয়া দরপত্রটি পুনরায় খুলে নতুনভাবে দর প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁর ওই দরপত্রটি খোলা যাবে না। এইভাবে নিলামদারগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁদের দর নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে প্রদান করতে পারবেন। অন্যান্য বিষয় off line-এ নিলামকারীগণ দর-আহ্বানকারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

সবশেষে বলি, এই ই-টেন্ডারিং চালুর ফলে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা এসেছে। টেন্ডারের প্রচার ও তাতে যোগদানের সুযোগ বেড়েছে ও সহজতর হয়েছে। আগামী দিনে সরকার আরো কম মূল্যের দরপত্রের ক্ষেত্রেও ই-টেন্ডারিং চালু করে ও e-payment-এর মাধ্যমে আরো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। তেমনি বিশেষ প্রযুক্তির কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ নিলামকারীদের পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে জনগণের সঙ্গে দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

লেখক : নির্বাহী বাস্তুকার ও সহ-বাস্তুকার
সেচ ও জলপথ দপ্তর

চাষি ভাইদের কাছে আবেদন

১। চাষের জন্য সেচের জল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবেন।
২। জলের অপচয় রোধে সজাগ হন।
৩। সেচের জল বেশি চাষের জমিতে ব্যবহারের জন্য একে অপরকে সাহায্য করুন।
৪। নিয়মবহির্ভূত খালের বাঁধ কেটে চাষের জমিতে জল ঢোকাবেন না।
৫। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচের জল ধরে রাখবেন না।
৬। সেচের জল সরবরাহ করার সময়কালে সেচ ও জলপথ বিভাগকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করুন।

সেচের জল চাষির বল।

নদী ভাঙন থেকে প্রাচীন মায়াপুরকে রক্ষার জন্য কর্মকাণ্ড

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

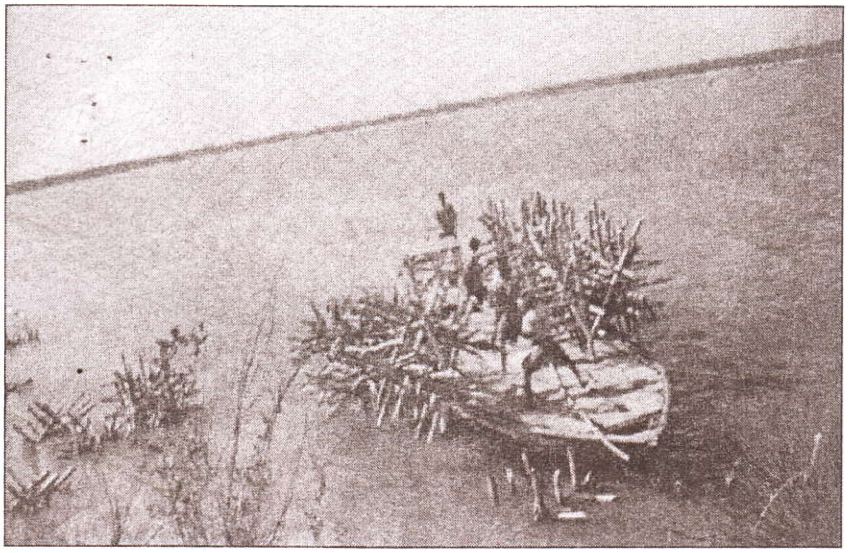

ভাগীরথী বা হুগলি নদী পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে নদীর প্রধান স্রোত বয়ে যেত এই হুগলি দিয়েই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকেই নদীর মূলস্রোত ঘুরতে থাকে ক্রমশই পূর্বদিকে। এখন মূল স্রোত পদ্মা দিয়েই বয়ে যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, পূর্বদিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা এখনও অব্যাহত আছে। দ্বাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেকার এই চারশো বছরে, গঙ্গার প্রধান জলধারা কয়েক বছর ভাগীরথী দিয়ে আবার কয়েক বছর পদ্মা দিয়ে যায়—এইভাবে ভাগাভাগি করে চলেছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে গঙ্গার মূল স্রোত পদ্মা দিয়েই চলে যাচ্ছে, আর ভাগীরথী বা হুগলি নদীকে একটা স্পিল চ্যানেল বা মজা নদীতে পরিণত করেছে। গঙ্গার জলরাশির সামান্যই কয়েক মাস ভাগীরথী পায়। কিন্তু ভাগীরথীর নিচের অংশে, (অর্থাৎ মোহনার দিকে যাওয়ার পথে) অনেক উপনদী পূর্বদিক ও পশ্চিমদিক থেকে ভাগীরথীতে মিলিত হচ্ছে বলে, এই নিচের দিকের জলপ্রবাহ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

গঙ্গা নদীর অনেক জটিল সমস্যা আছে। নদীর এপাড় ভাঙে তো ওপাড় গড়ে। নদীর এই দিক পরিবর্তনের প্রভাব বারবার পড়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির ওপর বা সেখানকার অর্থনীতির ওপর এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশের ওপর।

যেসব নদী পলিমাটি বয়ে আনে (অ্যালুভিয়াল) তাদের গতি সর্পিল হয়, আঁকাবাকা পথে চলে এবং বারবার দিক পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়া খুব ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। আর যতটা এলাকা জুড়ে নদীর এই খেলা চলে—অর্থাৎ মূল জলধারা বাঁ পাড় ঘেঁষে যাওয়া বা ডান পাড় ঘেঁষে যাওয়া—এই পুরো এলাকাটাকে বলে 'খাদির' (channel)। কিন্তু অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপরিকল্পিতভাবে নদীর ওপর ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য নদীর অনেক জায়গাতেই ওই খাদির সীমাটি সংকুচিত হয়ে গেছে। একটি নদীর খাদির সীমা কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল, তা বোঝা যায়, কতগুলো মজা খাল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে তা দেখে।

স্মরণাতীতকাল থেকে এইসব নদীর ভূমিক্ষয়ের সমস্যা ছিল বা আছে। বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার ভূমিক্ষয়, এতই ভয়াবহ যে, মানুষের ঘর-বাড়ি বা চাষের জমি ক্রমশই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার পর গঙ্গানদীর মূল জলধারার কিছু অংশ ভাগীরথীর মধ্যে ঢোকানো গেছে। কিন্তু এই জল ঢোকানোর জন্য, নদীর চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখেছি, নদীর পাড়ে যে বিপুল ভূমিক্ষয় হচ্ছে, তার কবলে পড়ে কত শস্যক্ষেত্র, জনপদ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অভাবিত বিপর্যয়ে যে বিশাল শস্যক্ষেত্র বা বাস্তুজমির অবলুপ্তি ঘটছে, তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই, মানুষ তীব্র আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। দাবি উঠেছে, ভূমিক্ষয় রোধ করে, মানুষের প্রাণ, বাড়ি, জীবিকা বাঁচাতে হবে।

প্রাচীন মায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থান :

ভাগীরথীর ডান পাড়ে এবং ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থল থেকে ২.৫০ কিলোমিটার উজানে প্রাচীন মায়াপুর অবস্থিত। মায়াপুর-নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি এবং নবদ্বীপ পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত।

প্রাচীন মায়াপুরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, বর্তমান গঙ্গাতীর থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে। বহু ধর্মীয় মঠ-মন্দির ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মায়াপুর ও নবদ্বীপ শহরে। নবদ্বীপ শহরের পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, ৫০০ বছর আগেও

ভাগীরথীর মূল স্রোত সেখান দিয়ে যেত, কিন্তু এখন তা শহরের একটা নিকাশি খাল মাত্র !

প্রাচীন মায়াপুরের সমস্যা

মোটামুটি ১৯৮০ সাল নাগাদ ভাগীরথীর ডান পাড়ে, মায়াপুরের কাছে নদীর পাড়ের ভাঙনের বিষয়টি নজরে আসে। প্রাচীন মায়াপুরের উজানে, ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে একটা মজা নদী পূর্বেই ছিল। এটাকে বলা হত 'শংকরপুর লুপ।' আটের দশকের শেষ ভাগে একটা প্রাকৃতিক কাট-অফ (Cut-off) শুরু হয়, অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের মুখ দুটোকে জুড়তে, একটা খাল কেটে দিলে যা হয়—সেই সর্টকাট পথে নদীর জল বইতে শুরু করল। ভাগীরথীর বাম পাড় ঢালুই রইল, চড়া পড়তেও শুরু করল। কিন্তু সমস্যা শুরু হল ডান পাড়ে।

২০০৭ সালের বর্ষার আগে, ভূমিক্ষয় রোধে যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল :

নদীর পাড় ও নদীর তলদেশের কনট্যুর ম্যাপ দেখে অনুমান হয়েছিল অবিলম্বে ভূমিক্ষয় রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে—নইলে নদী তীরে তৈরি করা মন্দির, স্কুল, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট সবই নদীগর্ভে চলে যাবে। তখনই একটা স্কিম বানানো হল এই যে ওই নদীর পাড় ১০০০ মিটার বাঁধানো হবে।

প্রথম পর্যায়ে ৪০০ মিটার বোলডার দিয়ে বাঁধানো হবে, আর তার নিচের অংশে অর্থাৎ বাকি ৬০০ মিটার দ্বিতীয় পর্যায়ে জিওসিনথেটিক (Geosynthetic) ব্যাগ দিয়ে বাঁধানো হবে।

প্রথম পর্যায় :

পাড়ের যে অংশটি বাঁক খেয়েছে অবতলভাবে (অর্থাৎ বাঁকের ভেতরের দিকটা) সেই ২৭০ মিটার দৈর্ঘ্যে ৪টি বেডবার ফেলা হবে। বেডবার হচ্ছে তারের জাল দিয়ে ঘেরা বড়োবড়ো পাথর, এমন দেওয়াল। ওই বেডবার নদীতে এমনভাবে ফেলা হবে, যেন তার মাথাটা, নদীর অন্তিম ভাটাতে জলের লেভেল থেকে ০.৫০ মিটার উঁচুতে থাকে। এর উদ্দেশ্য নদীর মূল জল-স্রোতের ধারাকে ভাঙার দিক থেকে ঘুরিয়ে নদীর মধ্যভাগের জলধারাতে পাঠানো।

নদীর পাড় বাঁধানো—নদীর পাড়ের ঢালুতে ০.১৫ মিটার পুরু ঝামা খোয়া বিছিয়ে (এটা ফিলটারের কাজ করবে) তার ওপর ০.৩৮ মিটার সাইজের বোলডার সাজানো। এই নদী পাড়ের ঢাল হবে ২:১ অর্থাৎ ২ মিটার সামনে গেলে ১ মিটার নামবে—এমন যে ঢাল।

টো-ওয়াল : তারের জাল মোড়া বোলডার ০.৬ মিটার চওড়া আর ০.৯ মিটার উঁচু এমন দেওয়াল নদীর পাড়ের নিচু অংশে, লো-ওয়াটার লেভেলে, নদীর পাঁড় বরাবর ২৭০ মিটার লম্বা টোওয়াল বসানো হবে।

এ্যাপ্রন : টো-ওয়াল থেকে নদীর ভেতরের দিকে বোলডার ফেলে যেতে হবে। প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে ২০ কিউবিক মিটার বোলডার জলে ঢালতে হবে। এছাড়া যে চারটি বেডবার নদীর আড়াআড়ি ফেলা হয়েছিল, তারও ধারে ধারে ওই রকম বোলডার বসাতে হবে। এখানে পুরনো স্থানচ্যুত বোলডারও (যদি থাকে) কাজে লাগাতে হবে। মোট খরচ পড়বে ২.৬৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পর্যায় : নদীর লো ওয়াটার লেভেলে জিওটেক্সটাইল ম্যাট্রেস লাগানো হবে পাড় বরাবর ৬০০ মিটার ধরে। এই জিওটেক্সটাইল চাদর (অনেকটা রবার সিট-এর মতন)-এর ওপর বালিভর্তি জিও-ব্যাগ চাপানো হবে। ঢাল রাখতে হবে ৩ : ১।

নদীর নিচের জলের তল থেকে ভাঙার ওপরের অংশ পর্যন্ত

(১) প্রথমে জিও সিনথেটিক ফিল্টার

(২) ০.৩৮ মিটার মোটা বোলডার সাজানো হবে

(৩) টো-ওয়াল : ০.৬০ মিটার চওড়া আর ০.৯০ মিটার উঁচু দেওয়াল পাড়ের নিচ বরাবর ৬০০ মিটার দীর্ঘ।

মোট খরচ : ৫.২৫ কোটি টাকা।

এই কাজ সম্পন্ন করেছিল নদিয়া জিলা পরিষদ—ব্যয়ভার বহন করেছিল সেচ দপ্তর।

ভূমিক্ষয় রোধের এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছিল ?

২০০৭-এর বর্ষা নামার আগেই পুরো কাজটার সিংহভাগই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনটে বর্ষা (বা বন্যা) হয়েছে। কিন্তু ২০০৭-এর মায়া-পুরের ব্যাঙ্ক লাইন বা নদীর পাড় যা ছিল, তাই আছে। ডান পাড়ের নদী বক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া অংশে আবার পলি জমতে দেখা গেছে। ৪টে আড়াআড়ি ফেলা বেডবারও অক্ষত আছে।

ভূমিক্ষয় রোধে সাফল্যের প্রতিক্রিয়া :

ডানপাড় গড়ল তো বাঁ-পাড় ভাঙল। ভাগীরথীর বাঁ-পাড়ে, অর্থাৎ প্রাচীন মায়াপুরের উল্টো পাড়ের উজানে বা ভাটার দিকে তীব্র ভূমিক্ষয় লক্ষ করা গেছে।

সিদ্ধান্ত : ভাঙনরোধে পরকুপাইন, অর্থাৎ শজারুর কাঁটার মতন শালবল্লার তৈরি বিরাট খাঁচার মধ্যে ইট-পাথর ভরে, তার দেওয়াল তৈরি করলে, তা মূল স্রোতকে পাড় থেকে নদীর দিকে ঠেলে দিলে ভালো কাজ দেয়। কিন্তু আগামী বছরের বর্ষা আসার আগেই সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশে পরকুপাইন প্রোটেকশন গড়ে তোলা দরকার।

জিওটেক্সটাইল আচ্ছাদন, বোলডার প্রোটেকশনের চেয়েও ভালো বিকল্প। কিন্তু মাটির প্রকৃতি এবং আরও অন্যান্য তথ্য জেনে নিয়ে সুচিন্তিতভাবে ওই জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করতে হবে। আবার, যেখানে ঘূর্ণির জন্য পাড়ের ভূমিক্ষয় হচ্ছে, সেখানে বোলডার ফেলে ভালো কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু নদীপাড় সংরক্ষণের ব্যাপারটি সুচিন্তিতভাবে করা দরকার, নইলে অপর পাড়ে ভাঙন শুরু হয়ে যাবে।

ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...

এপাড় ভেঙ্গে ওপার তুমি গড়.....

লেখক : নির্বাহী বাস্তুকার

সেচ ও জলপথ দপ্তর

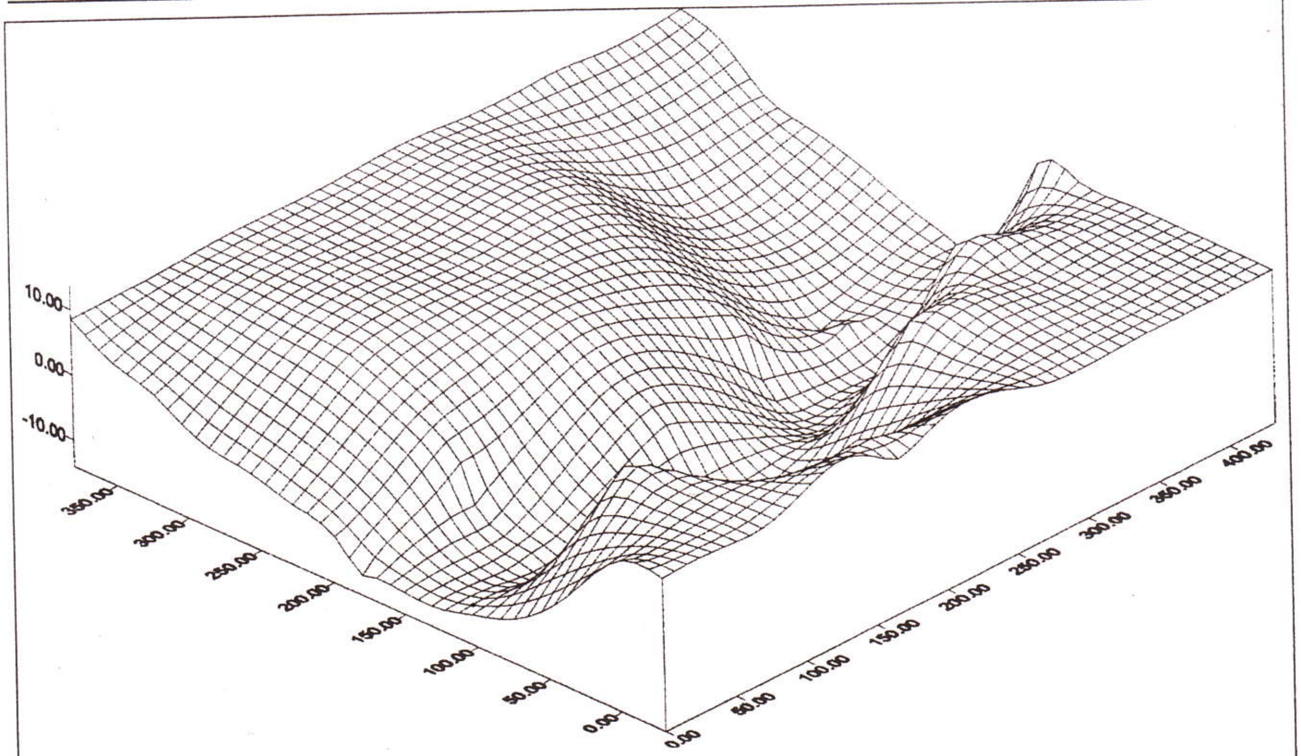

Isometric View of River Bed at site PRACHIN MAYAPUR

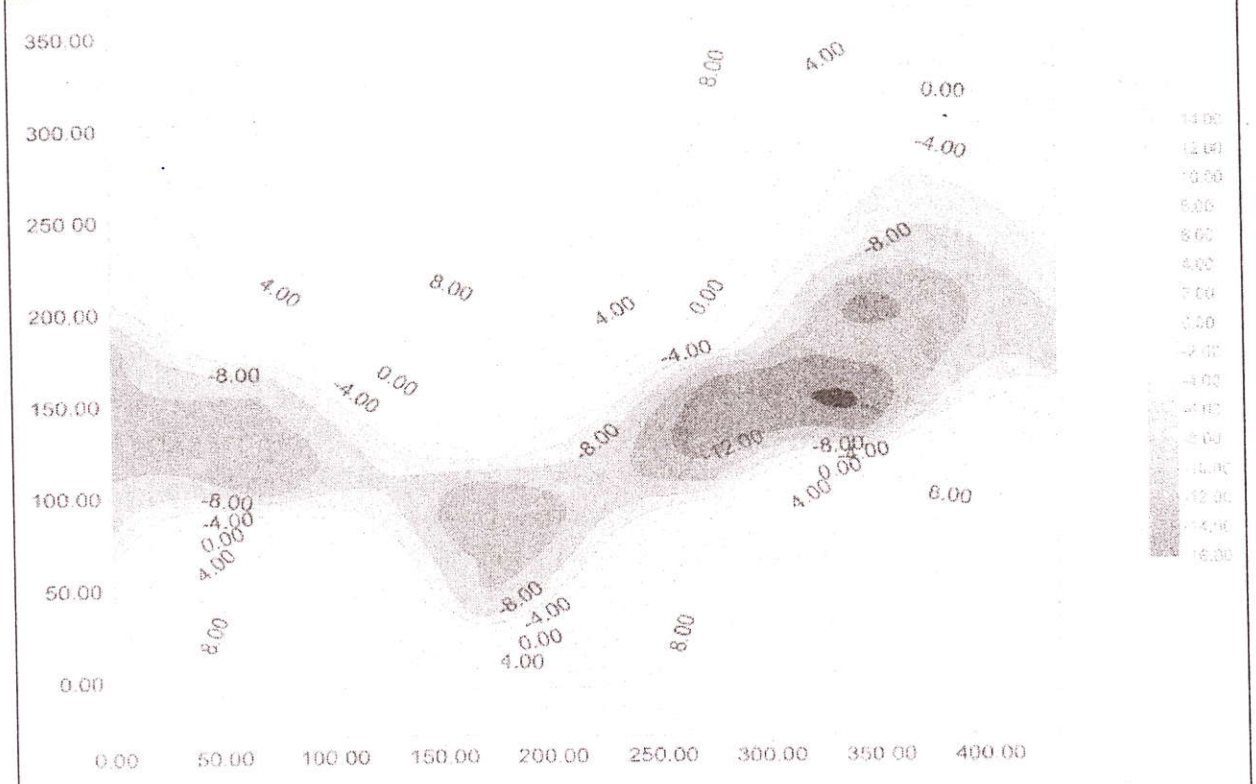

Contour Map of Prachin Mayapur Site

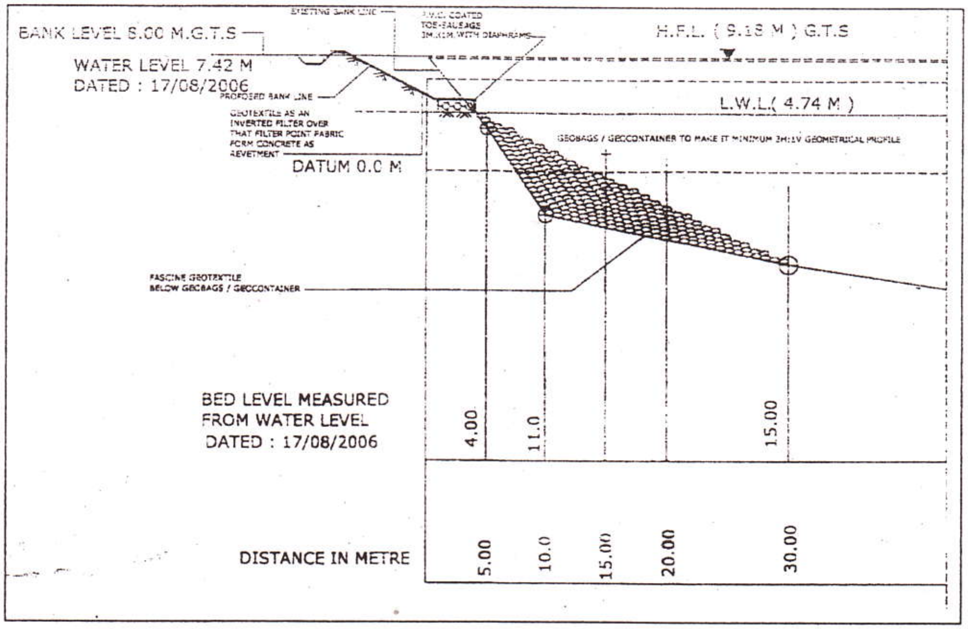

Sheet No :- 2 (iii)

Spur at Intermediate Point

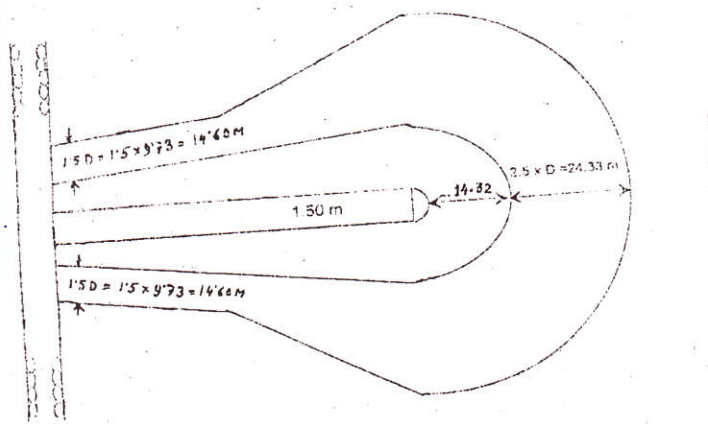

Plan of Spur at Prachin Mayapur

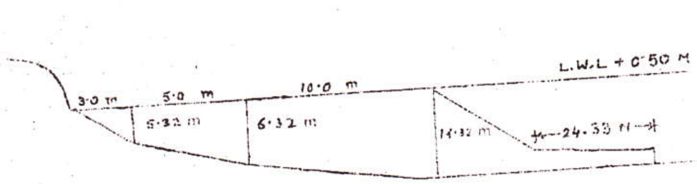

Cross Section of Spur at Prachin Mayapur

Chainage :- 1350m

ভাগীরথীর মূল স্রোত সেখান দিয়ে যেত, কিন্তু এখন তা শহরের একটা নিকাশি খাল মাত্র !

প্রাচীন মায়াপুরের সমস্যা

মোটামুটি ১৯৮০ সাল নাগাদ ভাগীরথীর ডান পাড়ে, মায়াপুরের কাছে নদীর পাড়ের ভাঙনের বিষয়টি নজরে আসে। প্রাচীন মায়াপুরের উজানে, ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে একটা মজা নদী পূর্বেই ছিল। এটাকে বলা হত 'শংকরপুর লুপ।' আটের দশকের শেষ ভাগে একটা প্রাকৃতিক কাট-অফ (Cut-off) শুরু হয়, অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের মুখ দুটোকে জুড়তে, একটা খাল কেটে দিলে যা হয়—সেই সর্টকাট পথে নদীর জল বইতে শুরু করল। ভাগীরথীর বাম পাড় ঢালুই রইল, চড়া পড়তেও শুরু করল। কিন্তু সমস্যা শুরু হল ডান পাড়ে।

২০০৭ সালের বর্ষার আগে, ভূমিক্ষয় রোধে যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল :

নদীর পাড় ও নদীর তলদেশের কনট্যুর ম্যাপ দেখে অনুমান হয়েছিল অবিলম্বে ভূমিক্ষয় রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে—নইলে নদী তীরে তৈরি করা মন্দির, স্কুল, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট সবই নদীগর্ভে চলে যাবে। তখনই একটা স্কিম বানানো হল এই যে ওই নদীর পাড় ১০০০ মিটার বাঁধানো হবে।

প্রথম পর্যায়ে ৪০০ মিটার বোলডার দিয়ে বাঁধানো হবে, আর তার নিচের অংশে অর্থাৎ বাকি ৬০০ মিটার দ্বিতীয় পর্যায়ে জিওসিনথেটিক (Geosynthetic) ব্যাগ দিয়ে বাঁধানো হবে।

প্রথম পর্যায় :

পাড়ের যে অংশটি বাঁক খেয়েছে অবতলভাবে (অর্থাৎ বাঁকের ভেতরের দিকটা) সেই ২৭০ মিটার দৈর্ঘ্যে ৪টি বেডবার ফেলা হবে। বেডবার হচ্ছে তারের জাল দিয়ে ঘেরা বড়োবড়ো পাথর, এমন দেওয়াল। ওই বেডবার নদীতে এমনভাবে ফেলা হবে, যেন তার মাথাটা, নদীর অন্তিম ভাটাতে জলের লেভেল থেকে ০.৫০ মিটার উঁচুতে থাকে। এর উদ্দেশ্য নদীর মূল জল-স্রোতের ধারাকে ভাঙার দিক থেকে ঘুরিয়ে নদীর মধ্যভাগের জলধারাতে পাঠানো।

নদীর পাড় বাঁধানো—নদীর পাড়ের ঢালুতে ০.১৫ মিটার পুরু ঝামা খোয়া বিছিয়ে (এটা ফিলটারের কাজ করবে) তার ওপর ০.৩৮ মিটার সাইজের বোলডার সাজানো। এই নদী পাড়ের ঢাল হবে ২:১ অর্থাৎ ২ মিটার সামনে গেলে ১ মিটার নামবে—এমন যে ঢাল।

টো-ওয়াল : তারের জাল মোড়া বোলডার ০.৬ মিটার চওড়া আর ০.৯ মিটার উঁচু এমন দেওয়াল নদীর পাড়ের নিচু অংশে, লো-ওয়াটার লেভেলে, নদীর পাড় বরাবর ২৭০ মিটার লম্বা টোওয়াল বসানো হবে।

এ্যাপ্রন : টো-ওয়াল থেকে নদীর ভেতরের দিকে বোলডার ফেলে যেতে হবে। প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে ২০ কিউবিক মিটার বোলডার জলে ঢালতে হবে। এছাড়া যে চারটি বেডবার নদীর আড়াআড়ি ফেলা হয়েছিল, তারও ধারে ধারে ওই রকম বোলডার বসাতে হবে। এখানে পুরনো স্থানচ্যুত বোলডারও (যদি থাকে) কাজে লাগাতে হবে। মোট খরচ পড়বে ২.৬৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পর্যায় : নদীর লো ওয়াটার লেভেলে জিওটেক্সটাইল ম্যাট্রেস লাগানো হবে পাড় বরাবর ৬০০ মিটার ধরে। এই জিওটেক্সটাইল চাদর (অনেকটা রবার সিট-এর মতন)-এর ওপর বালিভর্তি জিও-ব্যাগ চাপানো হবে। ঢাল রাখতে হবে ৩ : ১।

নদীর নিচের জলের তল থেকে ভাঙার ওপরের অংশ পর্যন্ত

(১) প্রথমে জিও সিনথেটিক ফিল্টার

(২) ০.৩৮ মিটার মোটা বোলডার সাজানো হবে

(৩) টো-ওয়াল : ০.৬০ মিটার চওড়া আর ০.৯০ মিটার উঁচু দেওয়াল পাড়ের নিচ বরাবর ৬০০ মিটার দীর্ঘ।

মোট খরচ : ৫.২৫ কোটি টাকা।

এই কাজ সম্পন্ন করেছিল নদিয়া জিলা পরিষদ—ব্যয়ভার বহন করেছিল সেচ দপ্তর।

ভূমিক্ষয় রোধের এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছিল ?

২০০৭-এর বর্ষা নামার আগেই পুরো কাজটার সিংহভাগই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনটে বর্ষা (বা বন্যা) হয়েছে। কিন্তু ২০০৭-এর মায়া-পুরের ব্যাঙ্ক লাইন বা নদীর পাড় যা ছিল, তাই আছে। ডান পাড়ের নদী বক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া অংশে আবার পলি জমতে দেখা গেছে। ৪টে আড়াআড়ি ফেলা বেডবারও অক্ষত আছে।

ভূমিক্ষয় রোধে সাফল্যের প্রতিক্রিয়া :

ডানপাড় গড়ল তো বাঁ-পাড় ভাঙল। ভাগীরথীর বাঁ-পাড়ে, অর্থাৎ প্রাচীন মায়াপুরের উল্টো পাড়ের উজানে বা ভাটার দিকে তীব্র ভূমিক্ষয় লক্ষ করা গেছে।

সিদ্ধান্ত : ভাঙনরোধে পরকুপাইন, অর্থাৎ শজারুর কাঁটার মতন শালবল্লার তৈরি বিরাট খাঁচার মধ্যে ইট-পাথর ভরে, তার দেওয়াল তৈরি করলে, তা মূল স্রোতকে পাড় থেকে নদীর দিকে ঠেলে দিলে ভালো কাজ দেয়। কিন্তু আগামী বছরের বর্ষা আসার আগেই সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশে পরকুপাইন প্রোটেকশন গড়ে তোলা দরকার।

জিওটেক্সটাইল আচ্ছাদন, বোলডার প্রোটেকশনের চেয়েও ভালো বিকল্প। কিন্তু মাটির প্রকৃতি এবং আরও অন্যান্য তথ্য জেনে নিয়ে সুচিন্তিতভাবে ওই জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করতে হবে। আবার, যেখানে ঘূর্ণির জন্য পাড়ের ভূমিক্ষয় হচ্ছে, সেখানে বোলডার ফেলে ভালো কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু নদীপাড় সংরক্ষণের ব্যাপারটি সুচিন্তিতভাবে করা দরকার, নইলে অপর পাড়ে ভাঙন শুরু হয়ে যাবে।

ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু
তোমারে...
এপাড় ভেঙ্গে ওপার তুমি গড়.....

লেখক : নির্বাহী বাস্তুকার
সেচ ও জলপথ দপ্তর

সুন্দরবন নদীবাঁধ এবং আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ

অমিত কুমার কুণ্ডু

সুন্দরবন এবং নদীবাঁধ :

সুন্দরবন এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সুন্দরবন ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপের ৪৪৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মনুষ্যবসতি আছে এবং অবশিষ্ট ৫১৩৭ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ অরণ্যাঞ্চল। এখানে মোট ১০২টি দ্বীপ অবস্থিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এখানকার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ। এই ৫৪টি দ্বীপ ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ দিয়ে ঘেরা। সুন্দরবনের অধিবাসীদের কাছে এই নদীবাঁধই জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রধান হাতিয়ার। অরণ্যাঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান—World Heritage-এর অন্তর্ভুক্ত। গোটা সুন্দরবন এলাকা ২০০১ সালে Global Biosphere হিসাবে চিহ্নিত।

সুন্দরবনের নদীবাঁধ মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সমুদ্র উপকূলবর্তী বাঁধ — ৪০ কিমি.
২। বড়ো নদীধারের বাঁধ — ১৫৬০ কিমি.
৩। মাঝারি নদীধারের বাঁধ — ১২০০ কিমি.
৪। ছোটো নদীধারের বাঁধ — ৭০০ কিমি.

সুন্দরবনের নদীবাঁধ সংক্রান্ত সমস্যা :

সুন্দরবন মূল সমস্যা হল অর্ধগঠিত এবং অপরিণত জমির উপর বসতি স্থাপন। এখনো এই ব-দ্বীপ অঞ্চলের গঠনপ্রক্রিয়া চলছে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ব-দ্বীপ অঞ্চলের গঠনপ্রক্রিয়ায় মানুষের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ প্রকৃতি মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ প্রকৃতির রোষে হামেশাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিধ্বস্ত হতে হয়।

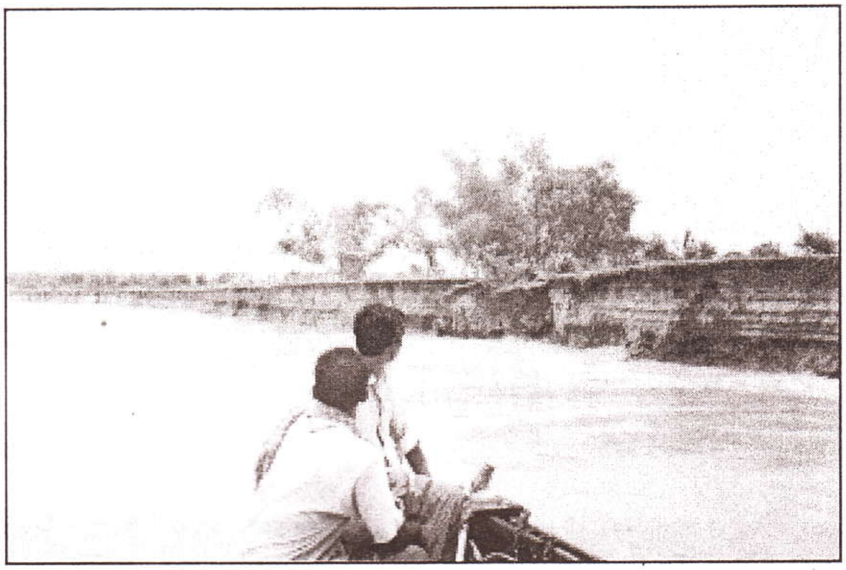

কয়েকশো বছর আগে গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন শুরু হয়—যদিও ওই সময়ে ব-দ্বীপ অঞ্চলের গঠনপ্রক্রিয়া পুরোদমে চলছিল, এমনকি এখনো চলছে। সুতরাং বলা যেতে পারে ওই সময় থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় জমিদার এবং জোতদাররা এই অর্ধগঠিত এবং অপরিণত জমিতে তাদের জমিদারির এলাকা বৃদ্ধির জন্য বসতি স্থাপনে মদত দেয়। যেহেতু এই জমিগুলি জোয়ারের সময় নোনা জলে পুরো নিমজ্জিত হয় তাই কৃষি এবং বসতির স্বার্থে এগুলি বাঁধ দিয়ে ঘেরা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। জমিদার ও জোতদারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে বেশি জমি দখলীকৃত করা যায়। যার ফলে তারা যতটা সম্ভব নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁধ তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে নদীবাহিত পলির বেশিরভাগই নদীপাড়ের কাছাকাছি জমা হয়। ফলে এই নদীসন্নিহিত অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের চেয়ে উঁচু হয়। খরচ কমানোর জন্য এবং যথাসম্ভব বেশি জমি দখলের জন্য জমিদার ও জোতদাররা নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁধ তৈরি করে। এই বাঁধ তৈরিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা তো ছিলই না, কোনো প্রযুক্তির ধারও তারা ধারত না। বাঁধের অবস্থিতি ও বিন্যাস (alignment) এবং আকৃতি ইত্যাদি কিছুই বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম মেনে করা হয়নি। ফলস্বরূপ হামেশাই এগুলি ভেঙে সংশ্লিষ্ট এলাকা প্লাবিত হয়। অনেক সময় কম উচ্চতার জন্য জোয়ারের নোনা জল বসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ে। বাঁধ দিয়ে ঘেরার ফলে এই জমিগুলিতে স্বাভাবিক পলি জমা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমির উর্বরতা ও উচ্চতাবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু একবার বসতি

স্থাপন করার পর মানুষকে বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়। যেহেতু অর্ধগঠিত ও অপরিণত (Premature) ভূমির উপর কিছু লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থে অপরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন করা হয়েছে তাই বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকলে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১। ফসল ও জমির ক্ষতি।

২। ঘরবাড়ির ক্ষতি।

৩। সেতু, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, জেটি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদির ক্ষতি।

৪। পশুখাদ্যের অপ্রতুলতা এবং ফলস্বরূপ পশুমড়ক।

৫। নোনা জল ঢোকার ফলে পরবর্তী অন্ততপক্ষে ২/৩ বছর জমি চাষের অযোগ্য হওয়া।

৬। মিষ্টি জলের পুকুর, ভেড়ি ইত্যাদির জল দূষিত ও লবণাক্ত হওয়ার জন্য মানুষ ও পশুর ব্যবহারের অযোগ্য।

৭। মিষ্টি পানীয় জলের একমাত্র উৎস গভীর নলকূপের ক্ষতির ফলে পানীয় জলের অভাব।

৮। মোটের উপর জীবিকার সমস্ত উৎস—যেমন চাষবাস, ফলফুল চাষ, মাছ ধরা, পশুপালন ইত্যাদি সব কিছুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

৯। জীবিকার সমস্ত উৎসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে অধিক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়।

আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও তার পুনর্নির্মাণ :

১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ সমেত সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের ভার নিজের হাতে তুলে নেয়। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি এবং ক্ষমতা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবনের নদীবাঁধে পর্যায়ক্রমে সংস্কার ও দৃঢ়ীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সুন্দরবন অঞ্চল ঝড়প্রবণ। প্রতি বছর এই অঞ্চল বড়ো/ছোটো/মাঝারি ধরনের ঝড়ের কবলে পড়ে। জোয়ারের সময় যদি তীব্রগতিসম্পন্ন ঝড় প্রবাহিত হয় তখন জীবনহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচণ্ডরকম বেড়ে যায়। গত ২০০৯ সালে এই রকম তীব্রগতিসম্পন্ন ঝড়-আয়লা-সুন্দরবন অঞ্চলে এক তাণ্ডবলীলা চালায় ; জীবন ও সম্পত্তির অভূতপূর্ব ক্ষতিসাধন করে। প্রায় ৯০০ কি.মি. নদীবাঁধ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও পুরোপুরি, কোথাও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রাণের পাশাপাশি নদীবাঁধের পুনর্নির্মাণ এই মুহূর্তে ভীষণ জরুরি হয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব এই বাঁধের পুনর্নির্মাণ করা একটি দুরূহ কিন্তু অবশ্যকর্তব্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য অঞ্চলের নদীবাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সুন্দরবনের নদীবাঁধ নির্মাণে প্রক্রিয়াগত কিছু তফাৎ আছে। উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ এই অঞ্চলে সব জায়গায় সম্ভব নয়। তাই এই অঞ্চলে স্থানীয় মালমশলা, শ্রমিক ও আঞ্চলিক প্রযুক্তি যথাসম্ভব ব্যবহার করে কাজ করাই বাস্তবসম্মত। নিম্নলিখিত কারণগুলি এই যুক্তির সমর্থক :

১। সুন্দরবনের বেশিরভাগ জায়গা সুগম নয়। ভারী আধুনিক যন্ত্রপাতি সেইসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে যাওয়া সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ।

২। সুন্দরবনের সব নদীতে দিনে-রাতে দুইবার জোয়ার-ভাটা খেলে। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রকৃত কাজের সময় ৫/৬ ঘণ্টার বেশি পাওয়া যায় না। ফলে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর যে সব কাজে সিমেন্ট দরকার হয় সেগুলির মান বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব পর্যায়ে পড়ে।

৩। নির্মাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টি জলের অভাব।

৪। এখানকার বাঁধগুলি নদীর পাড় ঘেঁষে তৈরি হয়েছে। জমির স্বল্পতার দরুন সেই বাঁধ হিসেবমতো পিছিয়ে দেওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তাই আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে প্রযুক্তিকে কিছুটা আপস করতে হয়।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঁধ ঘেঁষে বসতি তৈরি হয়েছে। সেই বসতি উচ্ছেদ করা খুব কঠিন।

৬। লবণাক্ত নদীর জল একবার চাষজমিতে ঢুকলে অন্তত ২/৩ বছর তা চাষের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৭। সুন্দরবনের নদীবাঁধ প্রায়শই জোয়ার এবং জাহাজ/নৌকো চলাকালীন উদ্ভূত ঢেউয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণ নদীবাঁধ প্রাযুক্তিক পরিকল্পনার (Design) সময় এই ব্যাপারগুলি ধর্তব্যের মধ্যে রাখার প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং নদীবাঁধ পরিকল্পনা করার সময় উপরোক্ত ব্যাপারগুলি মাথায় রাখা জরুরি। যদিও উপরোক্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিরিখে ধর্তব্যের মধ্যে রাখা সম্ভব নয়, তবুও পরিকল্পককে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপসের মধ্যে আসতে হবে।

সুন্দরবন নদীবাঁধ নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। সিমেন্ট কংক্রিটের তৈরি বাঁধ।

২। কোলবালিশ আকারের পলি-প্রপিলিন ভূনল (geotube) ব্যবহার।

প্রথমোক্ত পদ্ধতি নিম্নলিখিত কারণের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(ক) প্রচণ্ড ভারী।

(খ) তাড়াতাড়ি মেরামত সম্ভব নয়।

(গ) প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ।

(ঘ) এই ভারী বাঁধকে রাখতে গেলে মাটির শক্তি বাড়াতে অতিরিক্ত ব্যয়।

(ঙ) ভারী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণসামগ্রী প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহন করা কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় পদ্ধতির অসুবিধা—

(ক) প্রকৃতিবান্ধব নয়।

(খ) নির্মাণ সামগ্রীর অনেকটাই দেশজ নয়।

(গ) এগুলি তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহজে ও কম সময়ে মেরামত সম্ভব নয়।

(ঘ) জোয়ার-ভাটার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মাণকাজ চালানো খুব কঠিন।

(ঙ) ভূনলের (Geotube) মধ্যে কংক্রিট বেগে প্রবেশ (Inject) করানোর জন্য ভারী যন্ত্রপাতির দরকার হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

সুতরাং আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ মালমশলা, শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত প্রযুক্তিই এখানে প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তাই এই দুর্গম অঞ্চলে স্থানীয় মালমশলা ও যন্ত্রপাতি যা সহজে বহন ও ব্যবহার করা যায় যথাসম্ভব তাই-ই ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমানে নদীবাঁধ তৈরি করতে মূলত মাটি, সিমেন্ট, ইট, বালি, পাথর, বাঁশ, শালবল্লা, ইটের টুকরো ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের মাটি সাধারণত পলিমিশ্রিত এঁটেল মাটি, বালিমিশ্রিত পলিমাটি, বা এঁটেলমাটি। এই ধরনের মাটির সহন ক্ষমতা (Bearing Capacity) কম। সুতরাং এই কমজোরি মাটিকে প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এর সহনক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে এর উপর ভারী বাঁধ নির্মাণ করলে বসে না যায়। মাটির বাঁধের নদীতীরের ঢালকে রক্ষা করার জন্য আস্তরণ (Revetment) পরিকল্পনা (Design) করার আগে এর মাটি পরীক্ষা করা দরকার। যদি শুধুই এঁটেল মাটি (Clayee Soil) থাকে তাহলে কোনো পরিস্রাবক (Filter) দেবার দরকার নেই। পুরনো পদ্ধতি অনুসারে ইটের টুকরো দিয়ে পরিস্রাবক (Filter)-এর আস্তরণ তৈরি করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে কৃত্রিম ভূবস্ত্র (Synthetic Geotextile) অথবা পাট ভূবস্ত্র (Jute Geotextile) পরিস্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইটের টুকরোর (Brick bats) চেয়ে পরিস্রাবক হিসেবে পাট ভূবস্ত্রের সুবিধা :

১। ইটের টুকরোর পরিস্রাবকের চেয়ে পাট ভূবস্ত্রের দাম অনেক কম।

২। পাট ভূবস্ত্র তুলনামূলকভাবে অনেক হালকা ও পাতলা।

৩। যেহেতু এর ওজন কম তাই কম খরচে পরিবহনযোগ্য।

৪। পাট ভূবস্ত্র খুব কম সময়ে এবং সহজে কাজের জায়গায় স্থাপন (Instal) করা যায়। জোয়ার-ভাটার জন্য যেহেতু এখানে কাজের সময় অনেক কম পাওয়া যায় তাই সুন্দরবন অঞ্চলে এটির ব্যবহার খুব উপযোগী।

৫। প্রথাগত (Conventional) অর্থাৎ ইটের টুকরোর পরিস্রাবক প্রযুক্তিগতভাবে ঠিকঠাক প্রতিস্থাপন

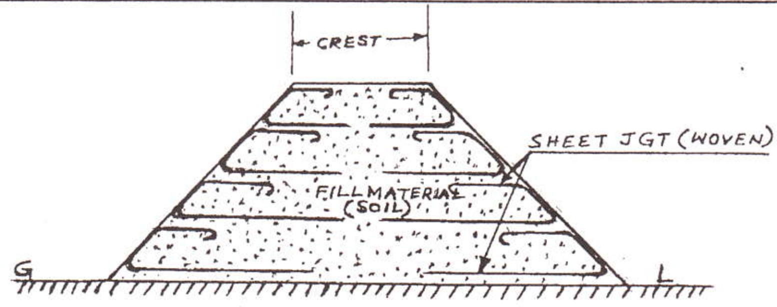

FIG-1

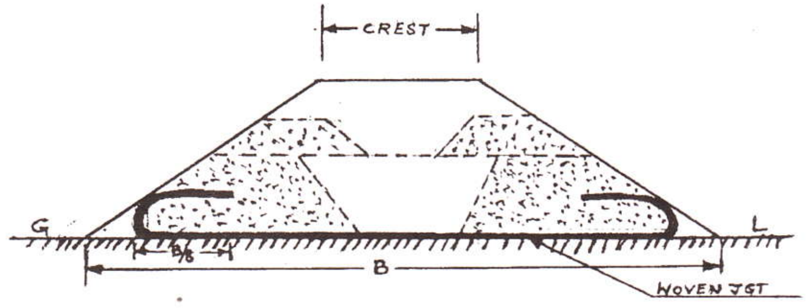

FIG-2

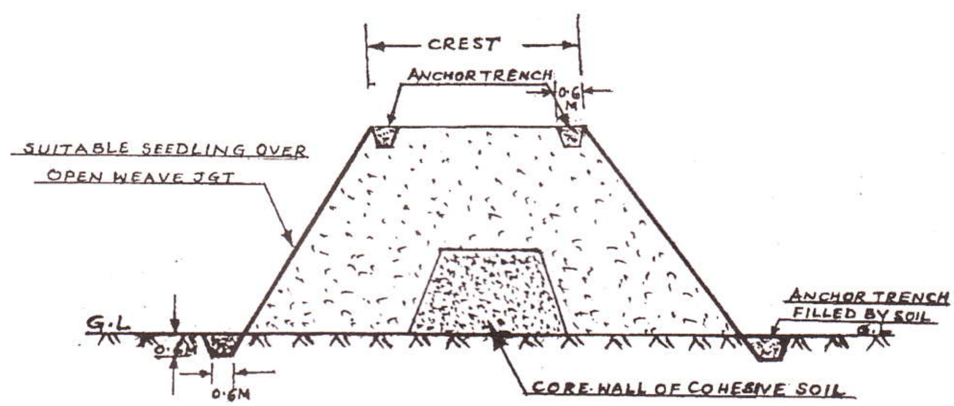

FIG-3

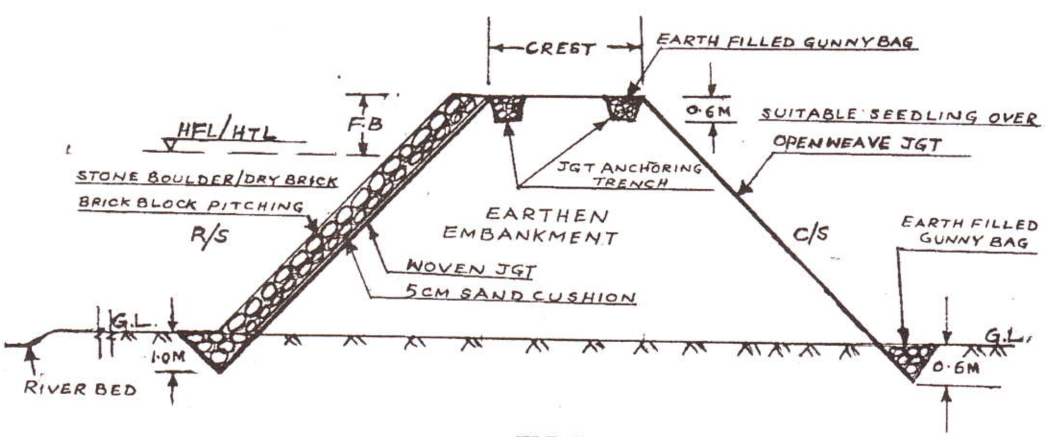

FIG-4

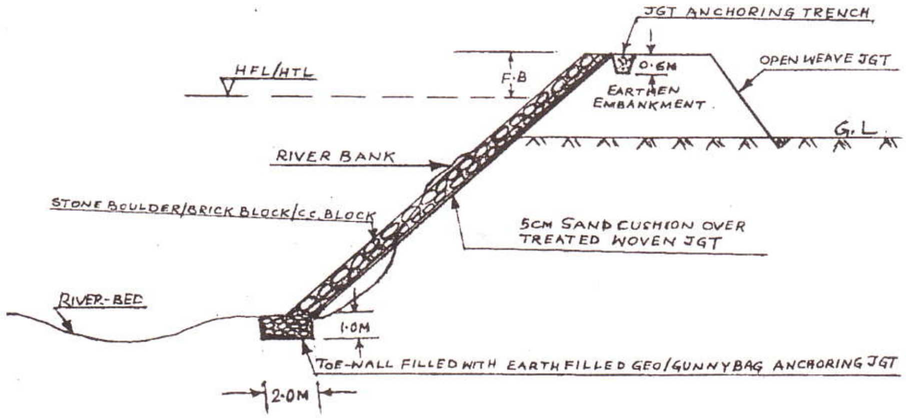

FIG-5

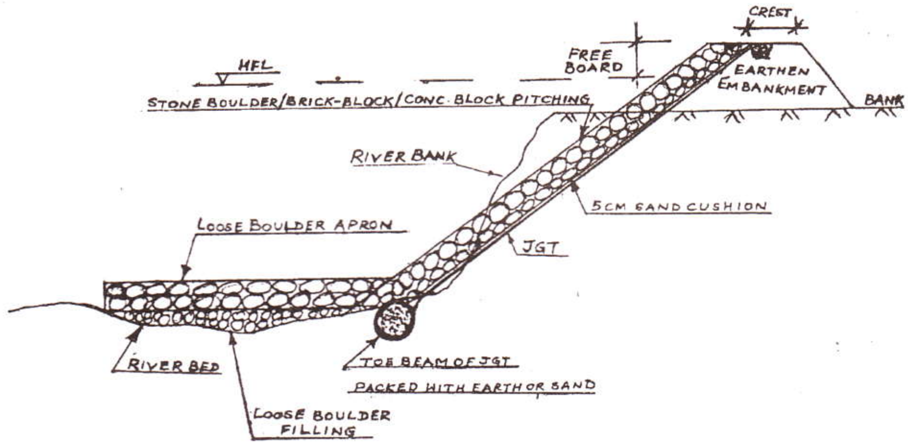

REVETMENT ON RIVER-BANK (H.F.L. HIGHER THAN AV BANK LEVEL)
FIG-6

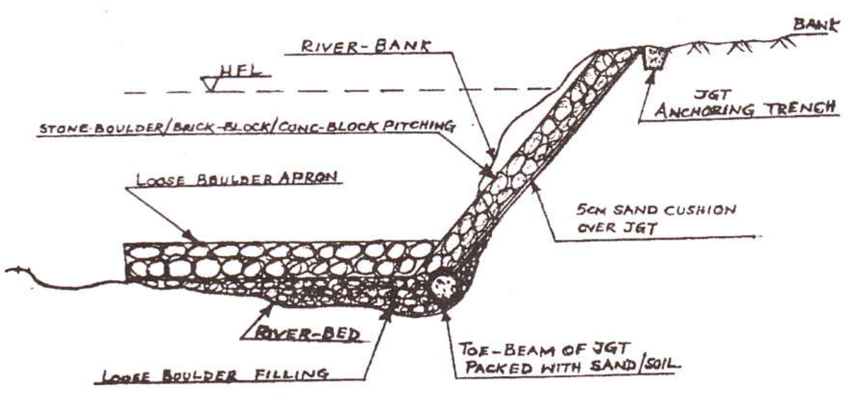

REVETMENT ON RIVER BANK (H.F.L. BELOW BANK LEVEL)
FIG-7

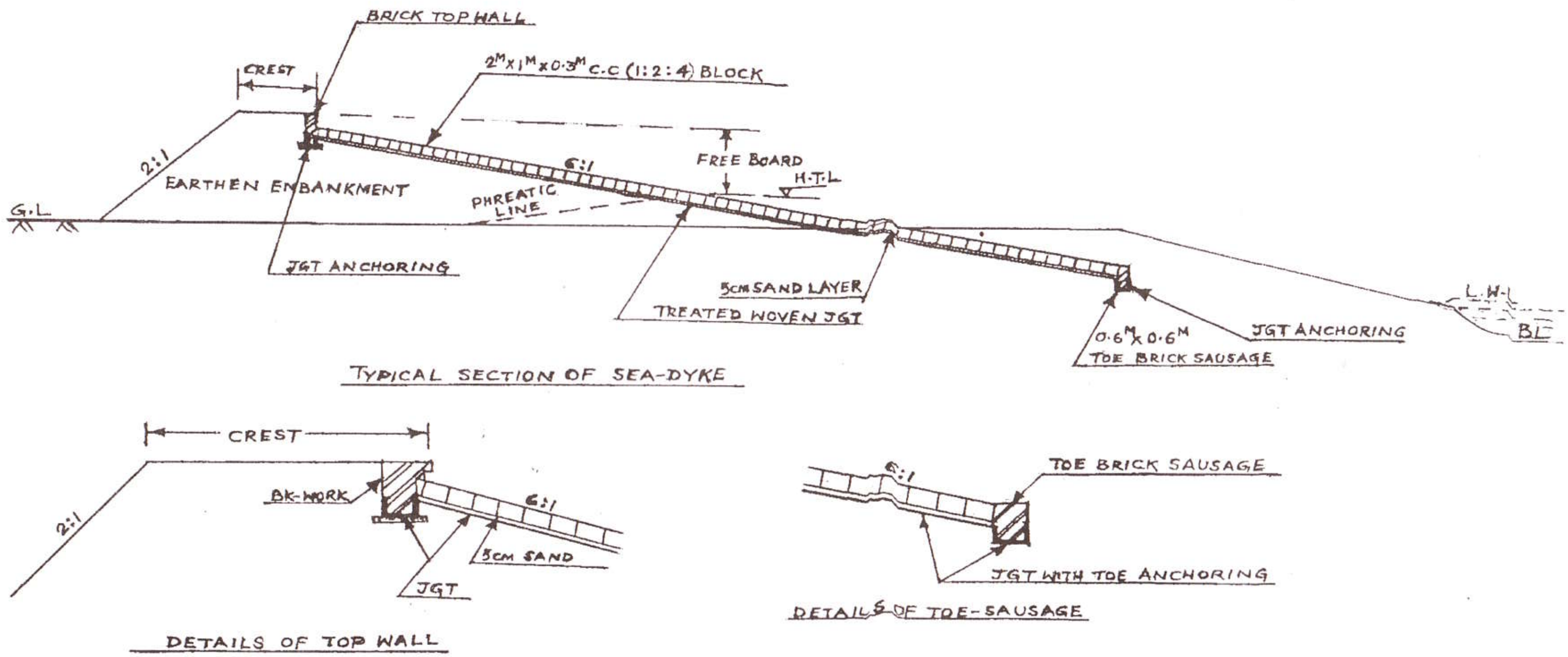

SEA-FACING EMBANKMENT (SEA-DYKE)

FIG-8

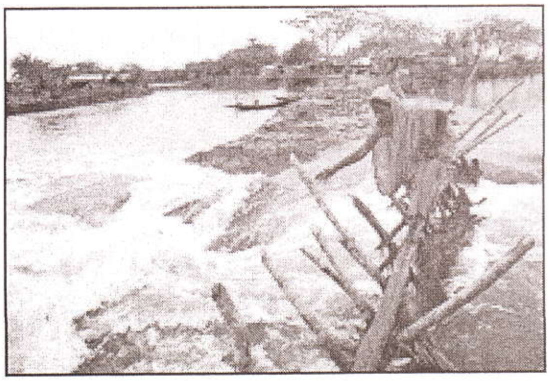

করা খুবই দুরূহ কাজ। কারণ বিপরীতমুখী পরিস্রাবক (Inverted Filter) তৈরি করার জন্য ইটের টুকরো ক্রমপর্যায়ে আকার অনুযায়ী সাজানো প্রায় অসম্ভব। সেখানে পাট ভূবস্ত্র ঈপ্সিত ছিদ্রময়তা (Desired porometry) অনুযায়ী কারখানায় তৈরি করা যায়।

৬। পাট ভূবস্ত্রের আচ্ছাদ্যতা (Drapability) খুব ভালো।

৭। *প্রথাগত পরিস্রাবকের চেয়ে পাট* ভূবস্ত্র মাটি এবং পাথর/ইটের ব্লক/ সিমেন্ট কংক্রিটের ব্লকের মধ্যে খুব ভালোভাবে বিভাজক (Separator) হিসেবে কাজ করে।

৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আপতকালীন সময় পাটভূবস্ত্র খুব সহজে এবং কম সময়ে কাজের জায়গায় পরিবহন এবং প্রতিস্থাপন করা যায়।

৯। মেরামত বা পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে পাটভূবস্ত্র খুব সহজে ব্যবহার করা যায়।

কৃত্রিম (Synthetic) ভূবস্ত্রের চেয়ে পাট ভূবস্ত্রের সুবিধা :

১। পাট ভূবস্ত্রের প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এটি জৈব-বিনাশক্ষম (Biodegradable)। তাই পরিবেশবান্ধব এবং প্রকৃতিতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। কিন্তু কৃত্রিম ভূবস্ত্র পচে নষ্ট হয় না তাই প্রকৃতির ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বর্তমানে গোটা বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় ভীষণভাবে চিন্তিত। সুতরাং এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২। পাট দেশজ উৎপাদিত সামগ্রী হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। কিন্তু কৃত্রিম ভূবস্ত্রের কিছু মৌলিক উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় যা দেশের সামগ্রিক অর্থভাণ্ডারে প্রভাব ফেলে।

৩। কৃত্রিম ভূবস্ত্রের চেয়ে পাটভূবস্ত্রের দাম অনেক কম হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় কম হয়।

৪। পাটভূবস্ত্র তৈরির জন্য দামি এবং ভারী যন্ত্রপাতির দরকার হয় না এবং খুব সহজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে তৈরি করা যায়। কৃত্রিম ভূবস্ত্র তৈরি করতে ভারী এবং দামি যন্ত্রপাতির দরকার হয়।

৫। পাটভূবস্ত্র যেহেতু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্গত তাই স্থানীয় লোকের চাকরির সম্ভাবনা বাড়ে।

৬। পাটতন্তু খুব ভাল জলশোষক। পাটতন্তু নিজের ওজনের পাঁচগুণ জল শোষণ করতে পারে। সেজন্য মাটি সংরক্ষণে (Soil Conservation) এটি খুব উপযোগী। কৃত্রিম ভূবস্ত্রের জল শোষণ ক্ষমতা নেই।

৭। কৃত্রিম ভূবস্ত্রের চেয়ে পাটভূবস্ত্রের আচ্ছাদ্যতা (drapability) অনেক বেশি।

প্রায়শই পাটভূবস্ত্রের স্থায়িত্ব নিয়ে এর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংস্থা প্রশ্ন তোলে এবং বলা হয় এটি কৃত্রিম ভূবস্ত্রের মতো টেঁকসই নয়। যদিও এটি সত্য, কিন্তু স্থায়ী প্রাকৃতিক পরিস্রাবক তৈরি করার ক্ষেত্রে পাটভূবস্ত্র অনুঘটক হিসেবে (catalytic agent) কাজ করে এবং স্থায়ী প্রাকৃতিক পরিস্রাবক তৈরি করার জন্য যে সময় দরকার হয় পাটভূবস্ত্রের স্থায়িত্ব তার থেকে বেশি। একবার প্রাকৃতিক পরিস্রাবক অর্থাৎ Filter-Cake তৈরি হয়ে গেলে পাটভূবস্ত্রের আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এই প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই ক্ষেত্রে পরিস্রাবকের কার্যকারিতা পরিস্রাবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পারিপার্শ্বিক মাটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই প্রথমবার জল প্রবাহিত হবার সময় কিছু সূক্ষ্ম মাটির দানা নষ্ট হয়। ভূবস্ত্রের একেবারে কাছের মাটির অংশে সূক্ষ্ম মাটির দানা বেশি নষ্ট নয় এবং এখানে শূন্যতার সৃষ্টি হয় যা অপেক্ষাকৃত মোটা দানার মাটি দিয়ে ভরাট হয়। এই মোটা দানার মাটির স্তর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম দানার মাটিকে আটকে রাখে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মাটির স্তরে প্রাকৃতিকভাবে বিপরীতমুখী পরিস্রাবকের সৃষ্টি হয়। একে প্রাকৃতিক পরিস্রাবক তৈরির পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি পূর্ণ হতে যা সময় লাগে পাটভূবস্ত্রের স্থায়িত্ব তার চেয়ে বেশি। এই প্রক্রিয়া ভারত এবং বিশ্বের অনেক গবেষণাগারে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। সুতরাং পাটভূবস্ত্রের স্বল্পস্থায়িত্ব আসল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিস্রাবক তৈরির পরিপন্থী নয়।

নিম্নোক্ত নকশাগুলিতে বাঁধের আকার ও প্রকার, নদীবক্ষে ও নদীপাড়ে ক্ষয়নিরোধক ব্যবস্থা এবং নদীধারের ঢাল সংরক্ষণের আস্তরণের পরিকল্পনা (Design) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল।

১। নদীতে প্রবাহিত জলের পরিমাণ, বেগ এবং জলতলের ঢাল

২। নদীপাড় ও নদীবক্ষের মাটির ধরন

৩। নদীর জলের উচ্চতল, নিম্নতল/ জোয়ার ও ভাটায় জলতল

৪। নদীবক্ষের ক্ষয়ের পরিমাণ

৫। নদীর বিস্তার ও সিক্ত অংশের দৈর্ঘ্য

৬। নদীপাড়ের গঠন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৬নং ও ৭নং নকশা সুন্দরবনের নদীর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রযোজ্য নয়।

লেখক : ভূতপূর্ব অধীক্ষক বাস্তুকার,
সেচ ও জলপথ দপ্তর।

সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার নিরিখে কিছু ভাবনা

দিলীপ কর্মকার

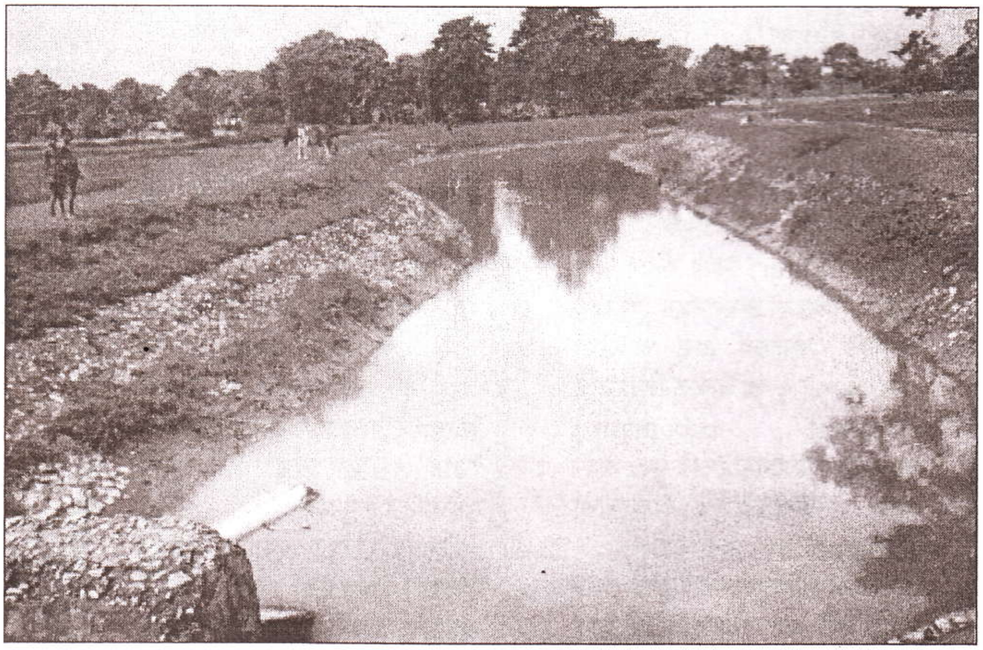

একটি নিকাশি খালের চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রকৃতির মাঝে এই বাদাভূমি বেশ কিছুটা স্বতন্ত্রতা বহন করে। ব-দ্বীপসমূহের সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এই অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কিছু ভাবনা উপস্থাপনের পূর্বে, সাধারণ নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। নিকাশি ব্যবস্থা কী, ব্যবস্থার প্রকারভেদ, নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি, ইত্যাদি, এখানে প্রথমেই উপস্থাপন করা হল।

নিকাশি ব্যবস্থা (ড্রেনেজ ব্যবস্থা) :

কোনো এলাকার অতিরিক্ত জল, বর্জ্য জল, গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত জল, বৃষ্টির অতিরিক্ত জল এলাকা থেকে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করা হয়, সেই সমগ্র ব্যবস্থাকে নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

নিকাশি ব্যবস্থার আবশ্যকতা :

সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের নিজেদের চাহিদাক্রমে যুগ যুগ ধরে গড়ে তুলেছে পাড়া, গ্রাম, শহর বা নগর। মানুষ একই এলাকাতে বসবাস করে একে অপরের সাহায্যার্থে ও সভ্যতার অগ্রগতির লক্ষ্যে। সমবেত হয়ে কর্ম করে সুস্থভাবে বাঁচার তাগিদে। যে এলাকাতে মানুষ বসবাস করে সেই এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে, এলাকার জনস্বাস্থ্য সঠিক মানে রাখার লক্ষ্যে, সর্বোপরি সভ্যতার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই নিকাশি ব্যবস্থার আবশ্যকতা।

নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রকারভেদ :

বহু প্রকার নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। মূলত কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেখানকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা কোন প্রকার হবে, তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানের ভূ-খণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এলাকার বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাতত্ত্ব, এলাকাটি নগর, শহর বা গ্রাম, এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানের আয়তন ও উন্মুক্ত স্থানের আয়তন, বসবাসকারী জনগণের জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সেই এলাকাতে কোন প্রকারের ড্রেনেজ ব্যবস্থা উপযুক্ত তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থার মধ্যে যেমন কাঁচা ড্রেন, পাকা ড্রেন (ইটের বা কংক্রিটের), ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন, পাকা ঢাকা ড্রেন, নিকাশি খাল ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া ভূ-খণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর কারণে পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে নিকাশি করা হয়ে থাকে।

সুন্দরবন এলাকাতে নিকাশি ব্যবস্থা :

পাহাড়ি এলাকা, সমতল এলাকা, টিলা এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থার থেকে সুন্দরবন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যদিও সুন্দরবন সমতল ভূমি, কিন্তু এলাকাটির গঠনতন্ত্রের জন্য এই ভিন্নতা। স্বভাবত সুন্দরবন এলাকার ভৌগোলিক

ও পরিবেশগত দিক এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যুগ যুগ ধরে একটু একটু পলিমাটির স্তর স্তূপীকৃত হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সন্নিকটে গড়ে উঠেছে এই সুন্দরবন অঞ্চল। ছোটো-বড়ো বহু ব-দ্বীপগুলি সীমায়িত হয়েছে নদী, নালা ও খাঁড়ির মাধ্যমে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল এই সুন্দরবন। এখানকার অর্ধেকের বেশি দ্বীপ সংরক্ষিত অরণ্য এলাকা। এই অঞ্চলের নদী জোয়ার-ভাটার নদী। জোয়ার-ভাটার জন্য এই এলাকার নদীর জলতল ওঠানামা করে থাকে। পেরেনিয়্যাল রিভার যেমন বছরের বর্ষাকালে বর্ষার অতিরিক্ত জল বহন করার জন্য নদীতে জলতল বৃদ্ধি হয় আর অন্যান্য সময়ে জলতল থাকে স্বাভাবিক, অর্থাৎ একই ধারাতে বইতে থাকে, তেমনি এই সুন্দরবনের নদীগুলির চরিত্র নয়। এখানকার এলাকার বর্জ্য জল, গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত জল, বৃষ্টির অতিরিক্ত জল নিকাশি খালের মাধ্যমে নদীগুলিতে নির্গত হয়ে থাকে। জোয়ারের সময় নদীতে জলতল বেশি থাকায়, সেই সময় নিকাশি খালের বহন করা জল নদীগুলিতে নির্গত হতে পারে না। আবার জোয়ারের জলতল বৃদ্ধির ফলে নদীর নোনা জল নিকাশি খালে যেন প্রবাহিত না হয় সেই নিরীক্ষেও সুন্দরবনের নিকাশি খালগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হয়। সমুদ্র সংলগ্ন সুন্দরবনের নদীগুলি অবস্থান হওয়াতে এখানকার নদীর জল নোনা। নদীর নোনাজল নিকাশি খালের মাধ্যমে এলাকার চাষের জমিতে ঢুকলে চাষাবাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। দ্বীপগুলির মধ্যে যে সকল গঞ্জ, গঞ্জ শহর বা শহর গড়ে উঠেছে সেই সব এলাকার বর্জ্য জল পাকা বা কাঁচা ড্রেনের মাধ্যমে দ্বীপগুলির মূল নিকাশি খালে বা শাখা নিকাশি খালে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এখানকার একটি দ্বীপের সমগ্র বর্জ্য জল একটি বা দুটি মূল নিকাশি খালের মাধ্যমে দ্বীপের সংলগ্ন নদীতে নিষ্কাশিত হয়। ফলে এই মূল নিকাশি খাল ও নদীর সংযোগস্থলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ত্রুটিপূর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য উদ্ভূত সমস্যা :

ডেনেজ ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে নিকাশি খালগুলিতে প্রবাহের গতি রুদ্ধ হয়। এলাকা জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। জোয়ার-ভাটার নদীর জল বিপরীতমুখী প্রবাহে নিকাশি খালগুলিতে নদীর নোনা জল পূর্ণ হয় এবং এলাকার বর্জ্য জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ওই জলে এলাকা জলমগ্ন হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে।

(ক) ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে নিকাশি খালগুলিতে প্রবাহের গতি রুদ্ধ হয় : জল প্রবাহ রুদ্ধ হবার বেশ কিছু কারণ দেখা যায় :

১। খালের (Longitudinal Slope) দৈর্ঘ্যের ঢাল সঠিক না হলে অর্থাৎ মাঝে মাঝে উঁচু-নিচু বা বিপরীত মুখে ঢালের কারণে জলপ্রবাহ নিকাশি খালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

২। নিকাশি খালের মাঝে যদি কোনো বাঁধা থাকে বা স্ট্রাকচার থাকে, যার ফোঁকর অর্থাৎ স্বাভাবিক-ভাবে খালে জলপ্রবাহের (Area) আয়তনের চেয়ে ওই স্ট্রাকচারের ফোঁকরের (Area) আয়তন কম হয়, তবে নিকাশি খালে জলপ্রবাহ বাধা হয়ে থাকে।

৩। খালের মাঝে মাঝে ঘন মাছ ধরার জাল ব্যবহার করাতে খালে জলপ্রবাহে বাধাপ্রাপ্ত ঘটে থাকে।

৪। বর্জ্য পদার্থ, জঞ্জাল, ভাসমান কচুরিপানা, আধুনিকতার উৎকর্ষতার জন্য ব্যবহৃত বিশাল পরিমাণের প্লাস্টিক প্রভৃতি খালে থাকলে নিকাশি খালে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৫। নিকাশি খালে বর্জ্য জল যদি অতিরিক্ত পলি বহন করে তবে ওই পলির বেশ কিছু অংশ খালের বেডে অর্থাৎ খালের তলদেশে জমা হতে থাকে। ক্রমে পলি জমে ওই নিকাশি খালের গভীরতা কমে যায়। এই কারণে যে পরিমাণে জলপ্রবাহ খালে হওয়া উচিত সেই পরিমাণে হয় না ও জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(খ) বিভিন্ন কারণসমূহের জন্য নিকাশি খালে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে খালের জল সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নিষ্কাশিত হয় না। ক্রমে নিকাশি খালের জল স্রোতহীন হয়ে খাল নিজেই ধারণ করতে থাকে। এরফলে ওই জল খাল পূর্ণ হয়ে এলাকা জলমগ্ন করে ও ধীরগতিতে প্রবাহের কারণে বহুদিন সময় লাগে ওই জল নিষ্কাশিত হতে। চাষের জমিতে জল ঢুকে স্থির হয়ে থাকলে চাষবাসের বেশ ক্ষতি সাধন করে থাকে। বর্জ্য পদার্থসহ বিভিন্ন পদার্থ দীর্ঘ সময়ে নিচু এলাকাতে জমে থাকার ফলে তা পচন ধরে ও পরিবেশকে দূষিত করে থাকে। বেশি সময় জল জমে থাকার ফলে এলাকাতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এমন কী অনেক সময় মহামারির রূপ ধারণ করে থাকে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) জোয়ার-ভাটা নদীতে নিকাশি খালের জল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে ভাটার সময়। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হতে থাকে। সুন্দরবনের নিকাশি খালগুলি যেখানে নদীর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই স্থানে সঠিকভাবে নিষ্কাশন করার লক্ষ্যে বিশেষভাবে স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যাতে চাহিদা অনুযায়ী নিকাশি খালের জল নিষ্কাশিত করা যায়। এই স্ট্রাকচারের দুটি গেট বা পাটা থাকে। জমির দিকে যে গেটটি স্থাপন করা হয় তাকে (Draw Shutter) ড্র-সাটার বলা হয়। আর নদীর প্রান্তে যে গেটটি স্থাপন

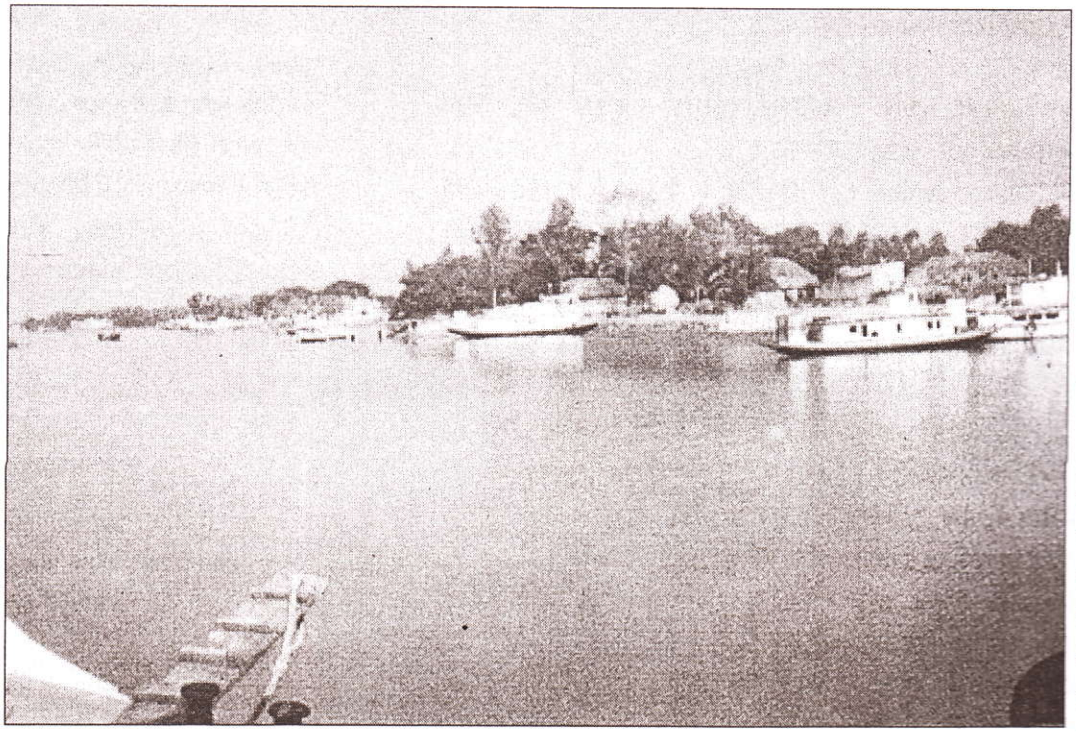

সুন্দরবনের একটি নদী

করা হয় তাকে (Flap Shutter) ফ্লাপ-সাটার বলা হয়ে থাকে। নিকাশি খালের জল নিষ্কাশনে ভ্রু-সাটার প্রয়োজনমতো ওঠানামা করিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয়ে যাবার পর নদীর দিকের ফ্লাপ-সাটার নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে নদীতে জোয়ারে জলতল বৃদ্ধি হলেও নদীর জল সুন্দরবনের নিকাশি খালগুলিতে প্রবেশ করতে পারে না। এই স্ট্রাকচার অর্থাৎ স্লুইসগেটে ত্রুটি থাকলে বা সঠিকভাবে এর গেট বা পাটাগুলি নিয়ন্ত্রণ না হলে অনেক সময় নদীর জোয়ারে জল নিকাশি খালে প্রবেশ করে থাকে। ওই সময় নিকাশি খালের বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হতে পারে না। ভাটাতে নিকাশি খালে ঢুকে পড়া নদীর জল প্রথমে নিষ্কাশিত হবার পর নিকাশি খালের বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। নিকাশি খালের বর্জ্য জল সঠিক সময়ে নিষ্কাশিত না হয়ে এলাকা জলমগ্ন করে ও এলাকাতে দূষণ সহ নানান সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ :

সুন্দরবনের বেশিরভাগ নিকাশি খালগুলির সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন খালের শেষাংশে অর্থাৎ নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত স্লুইস গেটের, যার মাধ্যমে নিকাশি খালের বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই স্লুইসের দুই ধারে (জমির দিকে ও নদীর প্রান্তে) খালের কিছুটা অংশ পিচিং করা থাকে। নিকাশি বা ড্রেনেজ খালগুলির আধুনিকীকরণের জন্য প্রথমে প্রয়োজন সঠিক নকশাকৃত আকৃতিতে ও সঠিক ঢালে খালগুলি খনন করা। যে সকল সুতির খাল বর্জ্য জল বহন করে নিয়ে এসে মূল নিকাশি খাল নিষ্কাশিত করে সেই সব সুতির খালগুলি সঠিকভাবে খনন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সুতির খাল ও মূল নিকাশি খালের সংযোগস্থলে ছোটো স্ট্রাকচার নির্মাণ করা যেতে পারে। এই স্ট্রাকচারের গেটে যেন জাল (Net) লাগানো যায়। জাল লাগানোর ফলে সুতির খাল যে সকল ভাসমান পদার্থ অর্থাৎ ভাসমান ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ বিশেষ করে আজকের দিনের প্লাস্টিক বস্তু বহন করে নিয়ে আসে, তা ওই জালে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সরাসরি মূল নিকাশি খালে যেন তা নির্গত না হয়। এই জাল লাগানোর ফলে ভাসমান বর্জ্য পদার্থ এই স্থান থেকে অন্য স্থানে অপসারণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি যা ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে সঠিক ও সচল রাখতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই প্লাস্টিক জাতীয় ভাসমান বর্জ্য পদার্থ অন্যত্র অপসারণ করলে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে সঠিক ও সচল রাখা সম্ভব হবে। মূল নিকাশি খালের মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী চেক গেট (Check Gate) নির্মাণ করা যেতে পারে। চেক গেট নির্মাণের ফলে নিকাশি খালে আসা পলি অপসারণের সুবিধা ও ভাসমান ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নদীতে ফেলে পরিবেশ দূষণ না ঘটিয়ে অপসারণ করা যেতে পারে। খালের শেষ প্রান্তে যেখানে স্লুইস গেট বর্তমান, সেই অংশের খালে প্রয়োজন অনুসারে রক্ষার জন্য খালের তল সহ দুই পাশের ঢালে ইটের পিচিং করা যেতে পারে। স্লুইস গেটের পাটা ওঠানামার জন্য হস্তচালিত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে সহজে ও সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য যন্ত্রচালিত প্রক্রিয়ার বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে খালের দুই ধারে ও তলদেশে জিওফেব্রিক (Geofebric) ব্যবহার করে খালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যেতে পারে।

ড্রেনেজ প্রকল্প ব্যবহার করে নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা :

দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের নিকাশি বা ড্রেনেজ খাল শুধুমাত্র বর্জ্য জল নিষ্কাশিত না করে

সুন্দরবন এলাকার এই খালগুলিতে জল সংরক্ষণ করে চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে চেক গেট (Check Gate) নির্মাণে ও ব্যবহারে খালে জল সংরক্ষণ করা সহজ হবে। বর্ষার অতিরিক্ত জল নদীতে নিষ্কাশিত না করে খালের ধারণক্ষমতানুসারে জল সংরক্ষণ করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে ওই জল ব্যবহারে সবজি চাষ বা অন্যান্য চাষের পরিকল্পনা করা সম্ভব। খালে বছরের সব সময় একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় জল ধরে রাখলে ওই জলে বছরের কিছু সময়ের জন্য মাছ চাষের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার সহযোগিতা ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার সহযোগিতায় খালের জল ব্যবহার করে দুই ধারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সঠিক থাকলে খালের নিকট স্থানে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সব প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে নিকাশি খালে নিষ্কাশিত জলের পরিমাণ, এলাকার বৃষ্টিপাত, মাটির চরিত্র, এলাকার বিশদ তথ্য বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুন্দরবন এলাকার নিকাশি বা ড্রেনেজ খাল ব্যবহারে নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করা সম্ভব।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ :

ড্রেনেজ প্রকল্প সঠিকভাবে নকশানুযায়ী নির্মাণ হবার পর এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর জল নোনা তাই এখানকার স্ট্রাকচারগুলি নোনার কারণে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে প্রবল। নিকাশি খালগুলির সংস্কারের প্রয়োজন। খালের শেষাংশে অর্থাৎ নদী ও খালের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্ট্রাকচার স্লুইস গেট যার মাধ্যমে নিকাশি খালের বর্জ্য জল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে, তা অন্তত দুই বছর অন্তর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। খালের পলি উত্তোলন ও স্লুইস গেটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রয়োজনানুসারে সাধারণত শীতকালে করা যেতে পারে। নিকাশি খালের মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মিত চেক গেটগুলিরও মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। প্রয়োজন সঠিক সময়ে চেক গেটে বাধাপ্রাপ্ত ভাসমান বর্জ্য পদার্থের উত্তোলন। এছাড়া সুতির খাল ও মূল নিকাশি খালের সংযোগস্থানে নির্মিত ছোটো স্ট্রাকচারের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। এই স্থানের জালে যে সকল ভাসমান বর্জ্য পদার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা সঠিক সময়ে উত্তোলন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ করা যাতে পুনরায় খালে না আসে। খালের বেড়ে, বিশেষ করে স্লুইস গেটের কাছাকাছি স্থানের পলি না সরালে নিকাশি খালের বর্জ্য জল নদীতে নিষ্কাশিত হবার সময় পলি জলের সঙ্গে নিষ্কাশিত হয়ে স্লুইস গেটের নদীর দিকের অংশে জমতে থাকে। ফলে সামনের অংশ পলিতে নদীতলের উচ্চতা বৃদ্ধি হতে থাকে। এই কারণে নিকাশি খালের বর্জ্য জল নদীতে নিষ্কাশিত হতে বাধাপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক রাখার জন্য সময়ে মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।

ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা :

নিকাশি বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ না করে সমাজের অন্যান্যদের পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ড্রেনেজ খাল যে এলাকাতে অবস্থিত, সেখানকার যে সকল চাষি খালের জল ব্যবহার করে থাকে তাদের প্রতিনিধি, স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা যেতে পারে সমবায়। এই সমবায় মূলত নিকাশি খালের পরিচালনায় থাকবে। খালের ও খালের উপর নির্মিত স্ট্রাকচারগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজকর্ম ওই সমবায় পরিচালন সমিতির অধিকারে থাকবে। আশপাশের উপকৃত চাষিদের থেকে ও এলাকায় উপকৃত মানুষের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কর সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে সমবায়ের মাধ্যমে এই নিকাশি খালের পরিচালনা করা সম্ভব। কারিগরি সহায়তার জন্য ও মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সমবায়ের সকলের সম্মিলিত ভাবনা সরকারি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারের গোচরে এনে সরকারি অনুদান নিয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণ করা যেতে পারে। সুন্দরবনের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ভর করে এখানকার প্রাকৃতিক সম্ভার ও নদীনালার উপর। ফলে সমবায় পরিচালন সমিতি এলাকার মানুষ, চাষি সকলকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের নিকাশি খালগুলির পরিচালনা ও নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণ করলে এলাকার মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, এ আশা করা যায়।

উপসংহার :

সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রথমে ওই এলাকার জমির পরিমাণ, চাষের এলাকা, বসবাসের স্থান, বাজার-হাটের স্থান ও অন্যান্য বিশেষ স্থানের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করার প্রয়োজন। নিকাশি খালের জন্য কতটা এলাকা উপকৃত হবে এবং কীভাবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করার প্রয়োজন। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্য সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে কী ধরনের চাষ করা যায়, এসবের ভাবনা প্রথমেই ভাবার প্রয়োজন। উপযুক্ততা দেখে প্রকল্প রূপায়ণ হলে একাধারে যেমন এলাকার বর্জ্য জল সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশিত হবে, অন্যদিকে সংরক্ষিত জল দিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করা সম্ভব। সর্বোপরি এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসহ সুন্দরবন অঞ্চলের পরিবেশ সুন্দর থাকবে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

লেখক : সহ-বাস্তুকার
সেচ ও জলপথ দপ্তর

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গত ৪ জানুয়ারি, ২০১৩ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগর ব্লকে চেমাগুড়ি-ফুলডুবি খালের ওপর ১০টি কপাটযুক্ত বৃহৎ স্লুইস নির্মাণের শিলান্যাস করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্টুরাম পাখিরা, রাষ্ট্রমন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ এবং সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও মাননীয় বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিধায়ক ও চেয়ারম্যান, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। এই নির্মাণের ফলে তৈরি হবে মিঠাজলের আধার ও উপকৃত হবেন এলাকার বহু মানুষ।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে বাঁকুড়ার ওন্দায় গত ১০ জানুয়ারি, ২০১৩ কংসাবতী প্রকল্পের অন্তর্গত সেচ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কাজগুলির শিলান্যাস করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্যামাপদ মুখার্জী, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শিশু বিকাশ বিভাগ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাননীয় বিধায়ক ও অন্যান্য মাননীয় বিধায়কগণ-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতা পূরণের লক্ষ্যে এই বিশাল কর্মকান্ডের শিলান্যাস করা হয়।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে কলকাতা সংলগ্ন দক্ষিণ পাড়া তালবাগান কংক্রিট ব্রিজের উদ্বোধন হল ২৩ জানুয়ারি, ২০১৩। উদ্বোধন করলেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অরূপ বিশ্বাস, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যুব কল্যাণ ও আবাসন বিভাগ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত কংক্রিট ব্রিজের উদ্বোধনে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হল।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতা পূরণের লক্ষ্যে হাওড়া জেলায় সুপ্রশস্ত পাকা নিকাশি নালা নির্মাণ এবং হাওড়া ও হুগলি জেলায় বাইগাছি খালের উন্নতি সাধনে ও গান্ধী সেতুর সংস্কারের শুভ শিলান্যাস হল ৯ মার্চ, ২০১৩। শিলান্যাস করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি ছিলেন এলাকার মাননীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক সুলতান সিং ও ডঃ অনুপ ঘোষাল-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গত ১০ মার্চ, ২০১৩ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগজোলা খালের উপর প্রস্তাবিত পাকা সেতুর শিলান্যাস ও নোয়াই খালের উপর সদ্য নির্মিত পাকা সেতুর উদ্বোধন হল একই দিনের বিভিন্ন সময়ে। সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় রাজীব ব্যানার্জী। সভাতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ মাননীয় অধ্যাপক সৌগত রায় ও মাননীয়া শ্রীমতী কাকলি ঘোষদস্তিদার। শিলান্যাস করেন মাননীয় অধ্যাপক সৌগত রায় ও উদ্বোধন করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ। সভাতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ। নোয়াই খালের উপর নির্মিত পাকা সেতুর উদ্বোধনে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হল। বাগজোলা খালের উপর প্রস্তাবিত পাকা সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর অনুরূপভাবে এই সেতু সংলগ্ন এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন ও তাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় বিধায়ক তথা আবাসন ও যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল, ২০১৩ (রবিবার) নারকেলবাগান ঢালাই ব্রিজের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আবাসন ও যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ। এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হল এই ব্রিজের উদ্বোধনে।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আগ্রহে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গৃহীত দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকে হারা থেকে রায়তলা বাঁধের দৃঢ়করণ ও ভূমিক্ষয় রোধ প্রকল্পের কাজ ১৯ এপ্রিল, ২০১৩ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন সেচ ও জলপথ বিভাগ ও সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া, সোমেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্যান্য এলাকার সাধারণ মানুষ।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে ২১ এপ্রিল, ২০১৩ বীরভূম জেলায় লাভপুরে সদ্য নির্মিত ব্যারেজের শুভ উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী *রাজীব ব্যানার্জী। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত* সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী নূরে আলম চৌধুরী ও মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রায়-সহ বিভিন্ন অতিথি।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল, ২০১৩ বীরভূম জেলার রামপুরহাট-১ ব্লকে সদ্য নির্মিত পাকা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত নূরে আলম চৌধুরী ও মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রায়-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। সেতুটির জন্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হল।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উত্তর ২৪ পরগনার জেলার কাঁচরাপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত বাগের খালের উপর ২৭ এপ্রিল, ২০১৩ তিনটি নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সাংসদ মুকুল রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী, গোবিন্দচন্দ্র নস্কর ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের সহায়তায় ২৬ মে, ২০১৩ করলা নদীর উন্নতিকল্পে গৃহীত প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেব।

● মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে ৪ অক্টোবর, ২০১৩ কলকাতার নারকেলডাঙ্গা ব্রিজের শুভ শিলান্যাস করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিধায়ক পরেশ পাল। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ।

বিশেষ বার্তা

১। নিকাশি খালের সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত ইট, বাঁশ বা বল্লা খুশিমতো তুলে নেবেন না। এতে আপনারাই অসুবিধায় পড়বেন।

২। নিকাশি খালের সংরক্ষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সরকারের সাথে সবরকম সহযোগিতা করুন।

৩। নিকাশি খালে আবর্জনা, গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ, খাটালের বর্জ্য ফেলবেন না। এর ফলে খালের সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশ দূষণ ঘটবে।

সেচ ও জলপথ বিভাগ ● পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

৫ মে—২১ মে, ২০১৩ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর রবীন্দ্রভবনে সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্যের দ্বিতীয় বছর'—অনুষ্ঠানের রিপোর্ট।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে 'বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্যের দ্বিতীয় বছর' মহাসমারোহে উদ্‌যাপন হল, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে। **৫ মে থেকে ২১ মে, ২০১৩** এই কদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন হল সাফল্যের দ্বিতীয় বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেচ ও জলপথ বিভাগ। এখানে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও একটি প্রদর্শনী কক্ষ করা হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চ বা মূল মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাননীয় জেলাশাসক, মাননীয়া মহকুমা শাসক, মাননীয় মুখ্য বাস্তুকার,. নর্থ ওয়েস্টার্ন ও মাননীয় মুখ্য বাস্তুকার, সাউথ ওয়েস্টার্ন সেচ ও জলপথ দপ্তর, মাননীয় বিধায়ক, নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র, মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কেশিয়াড়ী, সেচ ও জলপথ দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ

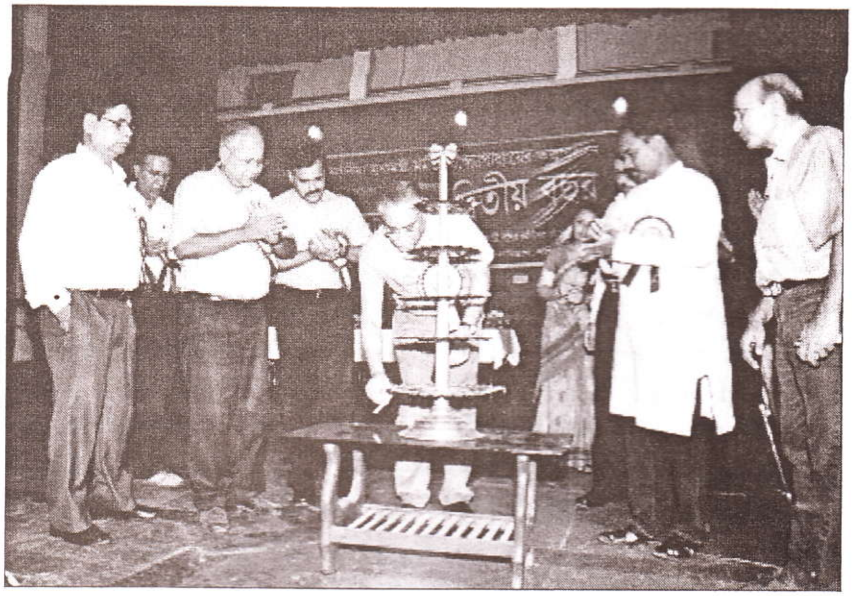

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা

ও কর্মচারীবৃন্দ, জেলার সাধারণ মানুষ সহ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে কয়েকদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমে উদ্বোধনী গান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন মাননীয় তুষারকান্তি ঘোষ, সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ এবং প্রদর্শনী কক্ষ উদ্বোধন করেন নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী দুলাল মুর্মু মহাশয়। এই কয়টি দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জেলার বিশেষ ঐতিহ্য-পূর্ণ নাচ, গান, পুতুল নাচ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় মূল মঞ্চে। প্রতিদিন জেলার শিল্পী ও বিভিন্ন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান হয়, যা উৎসবের রূপ ধারণ করে। সেচ ও জলপথ বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান, জেলার বিশেষ উন্নয়নের পরিসংখ্যান সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলার এই দুই বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ভিনাইল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনী কক্ষে প্রদর্শিত করা হয়। এছাড়া বিগত দুই বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান সম্মিলিত একটি পুস্তিকা, সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষ থেকে জনগণের মাঝে তাদের অবগতির জন্য বিতরণ করা হয়। জেলার কাজগুলি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জনগণের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতারও আবেদন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ এই উৎসব সাফল্যের সঙ্গে ২১ মে ২০১৩ সমাপ্ত হয়।

গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে কংসাবতী নদীর উপর **লালগড় সেতু** নির্মাণের কাজ

REGD. NO. WBBEN/2000/1027

January, 2014

উত্তর দিনাজপুরে ডাউক-নাগড় মুখ্য খালের উপর নবনির্মিত সেতু

ডাউক-নাগড় মুখ্য খালের দুই পাড়ে নবনির্মিত কংক্রিট লাইনিং